ছোটোদের গল্প

শৈলেন ঘোষ

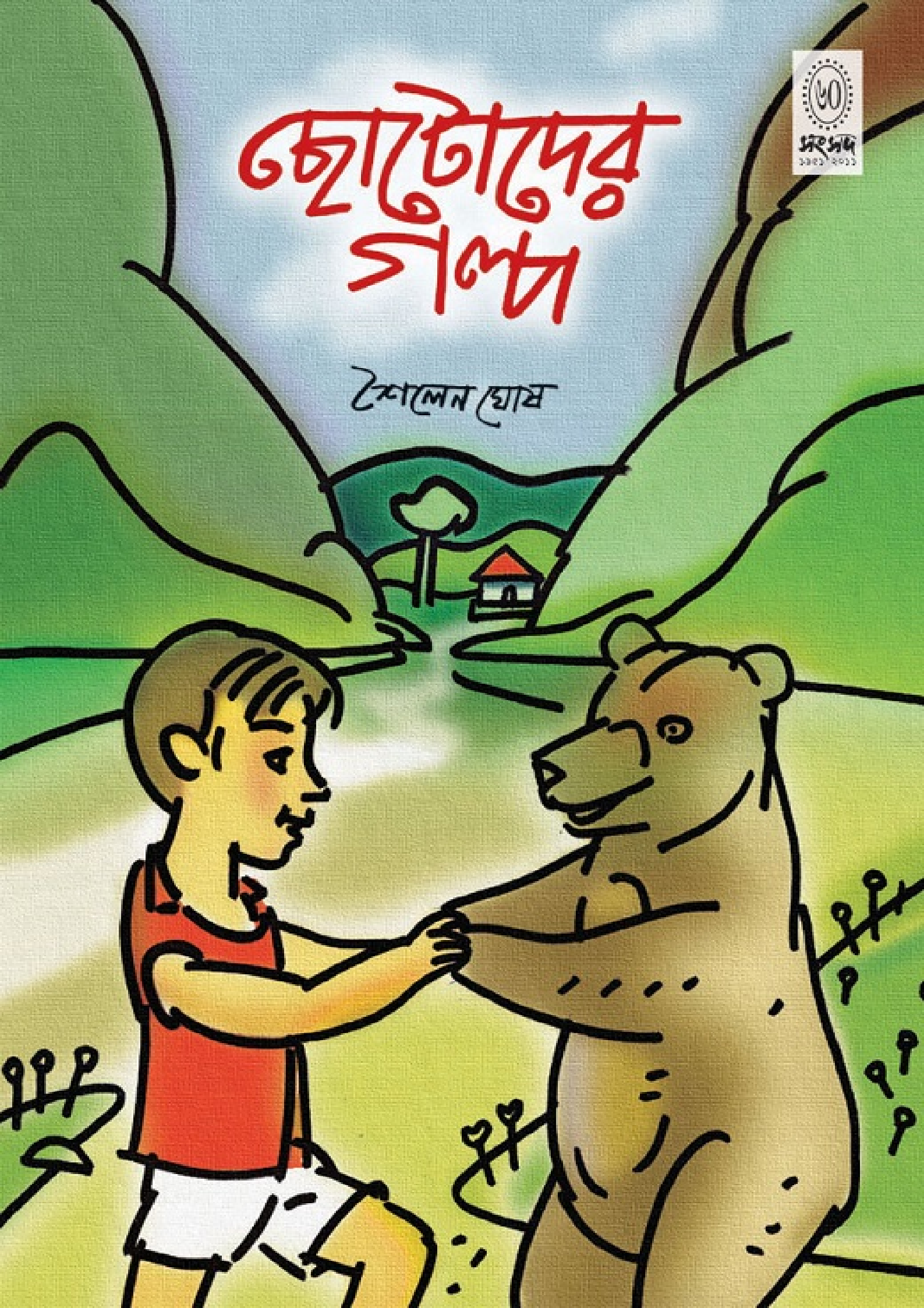

ছোটোদের গল্প

শৈলেন ঘোষ

সম্পাদনা

অশোককুমার মিত্র

শিশু সাহিত্য সংসদ

CHHOTODER GALPA

(Stories for Children)

by Sailen Ghosh

ISBN : 978-81-7955-148-6

© পাঠ্যবস্তু : লেখক

পুস্তকসজ্জা ও অলংকরণ : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অলয় ঘোষাল

প্রকাশক

দেবজ্যোতি দত্ত

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক

নটরাজ অফসেট

১ নিরঞ্জন পল্লি, তেঁতুলতলা

কলকাতা-৭০০ ১৩৬

সূচি

প্রকাশকের কথা

সম্পাদকের কথা

এ খেলা মস্ত মজার

জাদু যাকে বলে

নীল পালক

ময়না-মায়ের কান্না কেন

ভোঁকাট্টা

ইগলছানার মানুষ-মা

রেল ইঞ্জিন ঝমাঝম

সুহানি

বালুর বন্ধু তিতু

হঠাৎ সেদিন

রাজা বাপ্পাহুহুর দাড়ি

ছোট্ট পাখি টুনটুন

বুক্কুটা তাবলে বোক্কা নয়

টুং-এর বন্ধু ঝুমঝুমি

কানকাটা বাঘ

ইড়িং আর বিড়িং

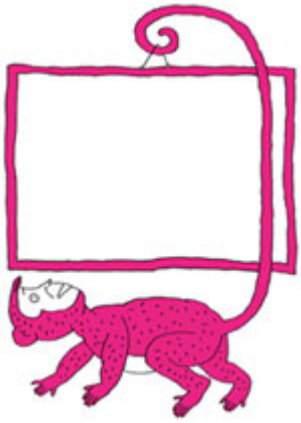

প্রকাশকের কথা

শিশু সাহিত্য সংসদের বয়স হল তিন কুড়ি। ছড়ায়-পড়ায়, গদ্যে-পদ্যে, জ্ঞানে-মনোরঞ্জনে এতখানি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুনির্মল বসু, সুখলতা রাও সেই থেকে আজও আছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যের সে ভাঁড়ারে আজও জোগান দিচ্ছেন। এ ছাড়া এখন যাঁরা দিয়ে চলেছেন : ছোটোদের জন্য গৌরী ধর্মপাল, শৈলেন ঘোষ ও বলরাম বসাক, ছড়া-কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ, কিশোর সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন এবং সদ্যপ্রয়াত মতি নন্দী। শিশু সাহিত্য সংসদের হীরকজয়ন্তী উদযাপন এঁদের নিয়েই, যাঁরা দিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই স্ব-নির্বাচিত লেখার সংকলন নিয়ে। জয়ন্তী উদযাপনের এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে!

এ প্রসঙ্গে শ্রীঅশোককুমার মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখা জোগাড় থেকে সম্মতি সংগ্রহ পর্যন্ত সব কাজ করে সংকলনগুলিকে সম্ভব করে তুলেছেন। তাঁর উৎসাহের তুলনা নেই। সর্বোপরি তাঁর যোগ্য সম্পাদনাতে সংকলনগুলি আশা করি পাঠকদের মনের মতো হয়ে উঠতে পেরেছে।

মতি নন্দী হঠাৎই চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তাঁর লেখার সম্মতিই নয় শুধু, শুভেচ্ছাও রেখে গেছেন। সবার জন্যে।

কলকাতা

দেবজ্যোতি দত্ত

সেপ্টেম্বর ২০১০

সম্পাদকের কথা

ইংরেজিতে ছোটোদের জন্য রংচঙে কত বাহারি বই, বিদেশি ভাষাতেও। বাংলায় তো তেমন একখানি বই-ও নেই। কেন? বাংলায় কি তেমন লেখক নেই, তেমন ছবি-আঁকিয়ে নেই? এমনই ভাবনা জেগেছিল এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর মনে। এতদিন তো জীবন কেটেছে বিদেশি নাগপাশ ছেঁড়ার লড়াইয়ে। সদ্যস্বাধীন দেশে ছোটোদের জন্য আনন্দ আর শিক্ষাদানের বই প্রকাশে উদ্যোগী স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ করলেন ছড়ার ছবি-১। পুরোনো দিনের ছড়ায় ছবি আঁকলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৯ সালে বেরোল চার রঙে ছাপা ছোটোদের মন-কাড়া বড়ো মাপের সেই বই, যা এতকাল তিনি চেয়ে এসেছিলেন। পরের বছরে বেরোল ছড়ার ছবি-২ আর ছড়া-ছবিতে অ আ ক খ। আর তখনই ঠিক হল স্থায়ী প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা। ১৯৫১-র ১ আগস্ট জন্ম নিল নতুন ধারার প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান, ছোটোদের সাহিত্যের জন্য 'শিশু সাহিত্য সংসদ' আর বড়োদের বইয়ের জন্য 'সাহিত্য সংসদ'। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য শুধু মুদ্রণ সৌকর্যেই নয়, বিষয় নির্বাচনেও। প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের পিছনে থাকে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, নিখুঁত সম্পাদনা ও অনুপম প্রকাশনা। শুরু থেকে প্রকাশনা মানের যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ, তাকে আজ এই হীরকজয়ন্তী বর্ষেও ধরে রেখে উন্নত করার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁর উত্তরসূরীগণ। এখন বিষয় নির্বাচনে তারা অতি সতর্ক, নিত্য উদ্ভাবক। প্রকাশন সৌষ্ঠবে দরদি ও নিপুণ।

শৈলেন ঘোষ ছোটোদের জন্য লেখালেখি শুরু করেছিলেন ছেলেবেলায়। সারা জীবন তিনি ছোটোদের জন্যই লিখে চলেছেন। লিখেছেন গল্প-উপন্যাস-নাটক, তার মধ্যে কখনো গুঁজে দিয়েছেন কবিতা-ছড়ার টুকরো। অসংখ্য ও চমৎকার রূপকথার কথাকার বলে তাঁকে দক্ষিণারঞ্জনের উত্তরসূরি বলা হয়ে থাকে। তবে তাঁর রূপকথা ঠাকুরমা-দিদিমাদের মুখে বলা কাহিনির লিখিত রূপ নয়, সবই তাঁর মৌলিক ভাবনার ফসল। ছাত্র জীবনেই ছোটোদের জন্য ছুটির সানাই নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে রসিক মহলে নজর কেড়েছিলেন। পরে বন্ধু দিলীপ দেচৌধুরীর সঙ্গে সম্পাদিত সাপ্তাহিক রবিবার-এর প্রকাশ তো বাংলা ছোটোদের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। নাটকের জগতেও তাঁর অনায়াস বিচরণ। বাংলার অনুপম রূপকথা অরুণ-বরুণ-কিরণমালার কাহিনির নাট্যরূপ দিয়ে ছোটোদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে রাষ্ট্রপতির

পুরস্কার এনেছিলেন ষাটের দশকে। তারপরে অসংখ্য নাটক তিনি উপহার দিয়েছেন তাঁর 'শিশু রঙ্গণ'-এর প্রযোজনায়।

তিনি শিশু সাহিত্যে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। টুই টুই তাঁর প্রথম উপন্যাস। পাখিদের নিয়ে লেখা সে বইটি তখন যথেষ্ট শোরগোল তুলেছিল। দৈনিক আনন্দবাজার-এর ছোটোদের পাতা আনন্দমেলায় বহুবছর ধরে গল্প লিখেছেন, আনন্দমেলা পূজা বার্ষিকীতে বহু বছর ধরে তাঁর উপন্যাস ছিল অন্যতম আকর্ষণ। তাঁর ছোটো গল্পেও হিরের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে। রূপকথা যেমন তাঁর গল্পের একটি প্রিয় বিষয়-তেমনি বাস্তব জগতও তাঁকে সমানভাবে টানে। ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে পরপর ছবি সাজিয়ে তিনি এক-একটি গল্প গেঁথে দেন, মনে হয় যেন আশ্চর্য সূচীশিল্প।

ঊএক রাজ্যে রাজা আছেন, রানি আছেন, ফুলের মতো সুন্দর রাজকন্যে আছে, কিন্তু তার চোখে আলো নেই। তা শুনে সেই রাজ্যের পাহাড়তলির ভাই-বোনের মনে বড়ো দুঃখ হল। রাজকন্যেকে দেখতে এসে তার দেখা না পেয়ে গান ধরল। গান শুনে সবাই মুগ্ধ, কিন্তু ক্রুদ্ধ রাজা ভাইকে করলেন আটক। বোন চলল জাদুমন্ত্র জানতে। জাদুমন্ত্রে রাজকন্যের চোখে আলো উছলে উঠল। সবাই খুশি। বন্দি ভাই ছাড়া পেল। ভাই-বোনে ফিরে চলল পাহাড়তলির গাঁয়ে।

শৈলেন ঘোষের সব গল্পই রূপকথার মায়াবী ভাষায় লেখা। তা থেকে সেরা গল্পগুলি বেছে নিয়েই তাঁর ছোটোদের গল্প। ছোটোদের হাতে আমাদের প্রিয় উপহার।

কলকাতা — অশোককুমার মিত্র

ডিসেম্বর ২০১০

আর খুবই ভালো লাগবে, এ দেশের প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক
পুস্তক প্রকাশক সংস্থা 'শিশুসাহিত্য সংসদ' বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্ণ
[illegible]। এটা কম গৌরবের কথা নয়, আনন্দের কথাও নয়।
তাই এদিকে এই বিষয় নিয়ে সাহিত্য-সমৃদ্ধ লেখাটির প্রস্তাবনা
অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।
শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র জী, এই সংস্থার এই কর্ণধার যাঁর প্রতি আমার
বিশেষ কৃতজ্ঞতা [illegible] সংসদের বিজ্ঞানভিত্তিক [illegible]
[illegible] [illegible] এবং তাঁর [illegible] [illegible] সাহিত্যের
কোন কিছু গ্রন্থ প্রকাশনার [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
প্রকাশ করে সার্থক হবেই।
নিবেদিত- কেবল শিশুসাহিত্য সংসদ। সাথে কেবল বিজ্ঞানভিত্তিক।

[illegible]
১০/৮/৯০

আমরা বলি, সাদা যেন দুধ, গোরুর। কিংবা বলি, সাদা যেন পাপড়ি, ফুলের। নয়তো বলি, সাদা যেন মেঘ, শরতের। কিন্তু কেউ কি বলি, সাদা ঝলমল পালক কেমন ওই হাঁসটার?

বলি না।

অবশ্য তার জন্যে দোষ দেওয়া যায় না কাউকে। কে একটা হাঁস, কোথায় থাকে কোন পুকুরে, সাঁতার কাটে সাতসকালে, না দিনদুপুরে, শামুক খায়, না গুগলি-গেঁড়ি, তার খোঁজ কে আর রাখে।

বটেই তো। তবে কিন্তু একটা কথা বলতেই হয়, তোমার পালক যতই সাদা ঝলমল করুক, তোমার গলার স্বরটি তা বলে তুলতুলে নয়। কী বিচ্ছিরি প্যাঁকপেঁকে!

সেই সাদা হাঁসটার কথাই হচ্ছিল। সেই বিচ্ছিরি কান-ঝিঁঝি ডাক ছেড়ে আর সেই সুচ্ছিরি সাদা পালকের জলুস ছড়িয়ে একদিন হাঁসটা পুকুরে সাঁতার কাটছিল। তখন যদি তার জাঁক দেখতে! একবার এদিক দেখে, একবার ওদিক ফেরে! একবার ডুব মারে, একবার দোল খায়! এমন ভাব দেখায়, যেন তার মতো রূপের বহর পৃথিবীতে আর কারও নেই!

তা, সে ঠিক আছে, তুমি ভাবছ তোমার কথা। এদিকে একটা কালো কুচকুচে ছাগছানা ভাবছে তার নিজের কথা।

কেন, ছাগছানার আবার কী হল?

কী হল বলতে গেলে সে অনেক কথা বলতে হয়। এখন যা হয়েছে সেই কথাটাই বলি, ছাগছানাটার এই দুপুর-রোদে ঘুরে ঘুরে জলতেষ্টা পেয়েছে।

তাতে ভাববার কী আছে? চোখের সামনেই তো পুকুর। পুকুরের জলে মুখ ঠেকিয়ে চুমুক দাও, তেষ্টা মিটে যাবে!

আরে বাবা, একথা তোমায় বলতে হবে কেন! ছাগছানা কি অন্ধ! সে তো নিজেই দেখতে পাচ্ছে, চোখের সামনে টলমল করছে জল। টলমল জলে চনমন করে সাঁতার কাটছে একটা হাঁস। হাঁসের গা ভরতি সাদা পালক জলের ওপর ছলকে ছলকে ঢেউ তুলছে। ছোট্ট ঢেউ দুলতে দুলতে ছড়িয়ে পড়ছে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই ঘটল সেই কাণ্ডটা। হয়েছে কী, ছাগছানাটা পুকুরপাড়ে ক-পা এগিয়ে জলে মুখ ঠেকাতে যাবে কী, হাঁসটা তাকে দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েই প্যাঁক প্যাঁক করে ডাক ছেড়ে, তরতর করে তেড়ে এসেছে। এসেই শুরু করে দিয়েছে হুজ্জতি: 'ছুঁবি না, ছুঁবি না, জলে মুখ দিবি না, দিবি না!' বলে সে কী চ্যাঁচামেচি!

তা, কে না জানে, আচমকা কেউ যদি এমন করে তেড়ে এসে খিঁচিয়ে উঠে হল্লা শুরু করে দেয়, তবে থতোমতো খেয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা মস্তানও। তো, ছাগছানার আর দোষ কী! সে তো পুঁচকে-পুচুং এইটুকুন। সুতরাং সে থতোমতো খেতেই পারে। জলে মুখ না দিয়ে হাঁসের মুখের দিকে চমকে তাকাতেও পারে।

হ্যাঁ, তা ঠিক। সে সত্যি সত্যি চমকে উঠল। হাঁসের মুখের দিকেও তাকাল। তারপর যখন দেখল এটাকে গুঁতিয়ে দিলেই লুটিয়ে পড়বে, তখনই কথা বলল। জিজ্ঞেস করল, 'ছুঁবি না মানে? জলে মুখ দিবি না মানে? আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি জল খাব না? আলবাত খাব!' বলে ছাগলছানাটা জলের দিকে মুখ বাড়াল।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এসে, ডানা ঝাপটিয়ে, হাঁসটা এমন জল ছিটিয়ে দিল যে, জলের তোড়ে ছাগছানা নাকাল। জল তো তার খাওয়া হলই না, এখন চোখের জলে, নাকের জলে হয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। অবিশ্যি সে পালাল না। ধড়ফড় করে জলের থেকে মুখ সরাতে গিয়ে ধপাস! এমন হড়কে পড়ল যে, দেখে, হাঁসটা হাসতে হাসতে প্যাঁকুল!

প্যাঁক প্যাঁক হাঁসের প্যাঁকুল প্যাঁকুল হাসি শুনে ছাগছানা রেগে টং। রাগের চোটে নাক ফসকে এমন হেঁচে ফেলল যে, ঘটে গেল আর এক কাণ্ড! হাঁচিটা সিধে হাঁসের মুখে আছড়ে পড়ল-বুড়ত!

ইস! কী ঘেন্না! কী ঘেন্না! হাঁসের মুখময় কী ছড়িয়ে পড়ল সে তো সবাই জানে! সে-নিয়ে কথা বলার আগেই হাঁসটা চটপট জলের ভেতর ডুব মেরে মুখটা ধুয়ে নিল। তারপর মুখ খিঁচিয়ে ছাগছানাকে তাড়া মেরে বললে, 'এই কেলটে, আমার মুখে হেঁচে দিলি কেন রে?'

এটা কিন্তু খুব অন্যায়।

কোনটা খুব অন্যায়?

ছাগছানাটা কালো। তাই বলে তাকে কেলটে বলে খোঁটা দেওয়াটা অন্যায়।

সত্যি বটে! খুবই অন্যায়। হতেই পারে, কারও গায়ের রং কালো, কিংবা ধরো, নাকটা একটু বোঁচা, কি চোখটা একটু ট্যারা, এতে তার তো কোনো দোষ নেই। সে যেমন খুঁত নিয়ে জন্মেছে! কাজেই কেলটে বলে খোঁটা দিতে ছাগছানাটাও যদি খেপে যায়, তুমি তাকে দুষতে পার না। আর বলতে কী, ছাগছানাটা সত্যি সত্যি খেপে গেল। খেপে গেল মানে, ভীষণ খেপে গেল। মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'এই হেঁসো, তুই তো ফ্যাক ফ্যাকে ফেঁসো! আমায় কেলটে বলিস কোন সাহসে?'

হাঁসও কম যায় না! ঝগড়ুটের একখানি! সে-ও প্যাঁক প্যাঁক, ট্যাঁক ট্যাঁক করে গলা ফাটিয়ে তাড়া মারল, 'এই কেলো, আমায় হেঁসো বললি কেন রে? জানিস আমার নাম হাঁসি!'

ছাগছানাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'এই হাঁসি আমায় কেলো বললি কেন রে? জানিস আমার নাম বাঁশি!'

অমনি হাঁসটা ঠোঁট উলটে বলল, 'বাঁশি, না ঘোড়ার ডিম! ওই তো গলার সুর-ব্যা-এ্যা-এ্যা!'

ছাগছানা বলল, 'তোর গলাটাই-বা কী এমন মধুর-প্যাঁ-প্যাঁ-এ্যাঁক! শুনলে কাঁদতে ইচ্ছে করে!'

হাঁসটাও কম যায় না। সঙ্গে সঙ্গে মুখ নাড়া দিয়ে বলে উঠল, 'তবে কি তোর ওই ব্যা-ব্যা ডাক শুনে আমার নাচতে ইচ্ছে করে!'

ব্যাস! ওই নাচের কথা শোনামাত্র ছাগছানা হাঁসকে শুনিয়ে দিল, 'জানলে তবে তো নাচবি! জানিস তো শুধু জলে ভাসতে। নাচা অত সোজা নয়!'

হাঁসও ছাড়বার পাত্তর নয়। মুখে মুখে শুনিয়ে দিল, 'তুই-ই-বা কী জানিস নাচের? ঘুরিস তো মাঠেঘাটে আর চিবুস তো ঘাস! ঘেন্না! ঘেন্না! ঘেন্না!'

ছাগছানাও কী কমতি যায়! সে-ই-বা ছাড়বে কেন! চ্যাটাং চ্যাটাং করে শুনিয়ে দিল, 'ওরে হাঁসি, আমায় তুই অত হেঁজিপেঁজি ভাবিস না। মাঠেঘাটে ঘুরতে যাব কোন দুঃখে! আর ঘাসই-বা খাব কেন? আমি কে, আর আমি কী খাই, আর কোথায় ঘুরি শুনলে, গায়ের জ্বালায় ছটফট করবি। আমার নাম জানিস? বাঁশি নয়, বুমবা। আমি কী করি জানিস? নাচি। আমি নাচের 'অ' থেকে 'ক' সব জানি। আমার ওস্তাদজি আমায় শিখিয়েছে। আমাদের একটা দল আছে। দলে কে কে আছে জানিস? গুড্ডু আছে, বানটি আছে

আর আমি আছি। গুড্ডু কে জানিস? একটা গাধা। বানটি একটা বানর। আর আমি? দেখতেই তো পাচ্ছিস আমি ছাগছানা। আমরা কী করি জানিস? আমাদের ওস্তাদজি আমাদের নিয়ে এদেশ যায়, ওদেশ যায়। স্বদেশ যায়, বিদেশ যায়। যে-দেশে যখন মেলা-মোচ্ছব হয়, ওস্তাদজি তখন সে-দেশে হাজির হয়। ওস্তাদজি আমাদের নিয়ে দারুণ দারুণ খেলা দেখায়। এই ধর, যেমন গুড্ডু ঘ্যাংকু-ঘ্যাংকু করে গান গায়, বানটি টাকডুম-টাকডুম করে ঢোলক বাজায় আর আমি তাকধিন-তাকধিন করে নাচি। সেই দৃশ্য ছেলে-বুড়ো যারাই দেখে, হাসতে হাসতে হাঁপিয়ে গড়াগড়ি খায়! এখন তোদের এখানে যে গাজনের মেলা হচ্ছে, সেখানে আমরা খেলা দেখাতে এসেছি। আর শোন, আমরা যখন নাচি, তখন আমাদের সাজ দেখলে তোর চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। কী ঝলমলে পোশাক আমাদের।

'তবে বলি শোন, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। এখন তো দুপুর। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। আজ মনে হয় ওস্তাদজির শরীরটা ভালো নেই। তাই একটু আয়েশ করার জন্যে শুয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাকে যে বেঁধে রাখবে, সেটাও ভুলে গেছে। ফাঁক পেয়ে আমিও তাই তোদের এই জায়গাটা কেমন, দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়েছি। ঘুরতে ঘুরতে আমারও তেষ্টা পেয়ে গেছে। আর তুইও এমন একলষেঁড়ে, আমায় একটু জলও খেতে দিলি না।'

এই পর্যন্ত শুনে হাঁসটাও যেন কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার বলা হল না। কেননা ছাগছানাটা হঠাৎ তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। সে শুনতে পেয়েছে তার ওস্তাদজির হাঁক: 'বুমবা-আ-আ! বুমবা-আ-আ!' ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ছাগছানা। পালাবে, না দাঁড়াবে, বুঝতে না পেরে জলেই মারল ঝাঁপ। পড়বি তো পড় গিয়ে হাঁসের পিঠে। এই রক্ষে যে হাঁসটা গায়ে-গতরে একটু শাঁসালো ছিল। আর ছাগছানাটা ছিল নেহাতই পুঁচকে-পুচুং। তাই হাঁসটা তাকে পিঠে নিয়ে জলে ডিগবাজি খেল না বটে, উলটে এমন থতোমতো খেয়ে গেল যে প্যাঁক-ক-ক করে চমকে উঠে তরতর করে সাঁতরে মাঝপুকুরে পগারপার!

আর বলতে কী, ছাগছানাকে ডাকতে ডাকতে ওস্তাদজিও তখন হাঁকপাক করে সেখানে হাজির। পুকুরের দিকে তাকিয়ে ওস্তাদজি তো থ! দেখে তার বুমবা হাঁসের পিঠে। হাঁস সাঁতার কাটছে, বুমবা হাওয়া খাচ্ছে। হাঁসটা সাদা, বুমবা কালো। দেখতে তো লাগছে ভালো! চোখ জুড়িয়ে গেল ওস্তাদজির। আর ডাকাডাকি নয়। বসে পড়ল পুকুরপাড়ে। দেখতে লাগল সেই দৃশ্যটা, আর মনে মনে ভাবতে লাগল, আহা রে এই খেলাটা যদি সত্যি সত্যি সবাইকে দেখানো যায়!

তবে একটা কথা বলি, কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, তোমরা কিন্তু চোখ বুঝলেই দেখতে পাবে।

তখন পৃথিবীতে ছিল না এমন বিজ্ঞানের চমক-ছোঁয়া-জাদুর ছড়াছড়ি। ছিল না পথচলতি মানুষের কানে কানে এমন সেলফোন। কিংবা ঘরে ঘরে ফ্রিজ-টিভি-ধোলাই মেশিন, কম্পিউটার। ছিল না রকমারি খাবারের খানাপিনা।

আকাশটা তখনও ছিল পাখিদের দখলে। ছুটত না তখন আকাশ খানখান করে ভয়ংকর যুদ্ধের অস্ত্র। মন চাইলেও গ্রহ থেকে গ্রহে যেতে পারেনি মানুষ। তখনও বন উজাড় করে গড়ে ওঠেনি বড়ো বড়ো শহর। হারিয়ে যায়নি গল্পবোনা-কল্পনার জাদুকাঠি।

তখনই এক নির্জন পাহাড়তলিতে থাকত চাঁদ আর অলি, ভাই আর বোন।

এখনও চাঁদ আছে, সে তো আকাশে।

এখনও অলি আছে, অসংখ্য, সে তো ফুলের বনে।

আছে পাহাড়, পাহাড়তলি।

আছে ঝরনা, জল ছলছল শব্দ।

কিন্তু নেই সেই চাঁদ, সেই অলি। সেই দু-টি ভাই-বোন। সে যে অনেক অ-নে-ক দিন আগের কথা। কিন্তু যখন তারা ছিল, তখন?

তখন পাহাড়তলির সেই সবুজ আঙিনাটা উছলে উঠত তাদের হাসিতে খুশিতে। শুধু চাঁদ আর অলি নয়। কত বন্ধু তাদের। তারা একসঙ্গে হাসত, ছুটত, খেলত, নাচত। কখনো খেলতে খেলতে পাথর টপকে তারা পাহাড়ের চুড়োয় উঠে পড়ত। চোখে ভেসে উঠত রাজবাড়ির তোরণটা, পড়ন্ত রোদের আলোয় ঝলমল করছে।

সবাই জানে রাজপ্রাসাদে রাজা আছেন, সুন্দরী রানি তাঁর। তাঁদের পুত্র নেই, আছে একটি কন্যা। সে সুন্দরী। মেয়ের রূপের কাছে বুঝি-বা রানিও হার মানেন। কিন্তু হায় রে, এরূপ থাকাও যা, না থাকাও তা! মিথ্যে!

কিন্তু কেন বলছ এমন অলক্ষুণে কথা?

না, না, অলক্ষুণে নয়, সে-কথা বড়ো দুঃখের। কেননা কন্যার চোখে আলো নেই! সে অন্ধ।

তাই দুঃখের শেষ নেই রাজা আর রানির। আর এই দুঃখের কথা এদেশে কারই-বা অজানা! দুঃখ চাঁদেরও, দুঃখ অলিরও। এমনকী তাদের সঙ্গীসাথি সবারও।

চাঁদ ভাবে, কেন এমন হয়! সবাই যখন আলো দেখে, একজন কেন দেখে না! সূর্যের এত আলো আকাশ উপছে ছড়িয়ে পড়েছে। কেন পারি না আমরা এই আলোর দু-টি ফোঁটা দুই আঙুলে ধরতে! দুই আঙুলের দু-টি ফোঁটা রাজকন্যার চোখে ছড়িয়ে দিতে! চাঁদ ভাবে, আর অলির চোখ দু-টির দিকে তাকায়! ভাগ্যিস! অলির চোখ দু-টি অমন অন্ধকারে হারিয়ে যায়নি!

কিন্তু চাঁদের চমক লেগেছিল একদিন অলির একটি কথা শুনে। অলি বলেছিল, 'এমন যদি সত্যি হত, আমার চোখ দু-টি রাজকন্যার চোখে পরিয়ে দিলে রাজকন্যা দেখতে পেত!'

'না-আ-আ-আ!' আঁতকে উঠে চিৎকার করে বোনকে ধমক দিয়েছিল চাঁদ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বোনকে আদর করেছিল। শান্ত গলায় বলেছিল, 'এমন কথা আমার বোনই বলতে পারে। কে পারে নিজের চোখ অন্ধজনের চোখে পরিয়ে নিজে অন্ধ হতে! কিন্তু একটা কথা বল তো অলি, তোর দু-চোখে যদি আলো না থাকে, তবে তুই যে আমায় দেখতে পাবি না আর কোনোদিন! তখন কী হবে? একজনের চোখের অন্ধকার ঘোচাতে গিয়ে, আমি যে অন্ধকার হয়ে যাব তোর চোখে! তখন তুই সইতে পারবি সেই দুঃখ?'

দাদার কথা শুনে থমকে গিয়েছিল অলি। দু-টি চোখ তার অশ্রুফোঁটায় ছলছল করে উঠেছিল। তারপর বলেছিল, 'আমার বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে রাজকন্যাকে। দেখতে ইচ্ছে করে রাজাকে, রানিকে।'

চাঁদ উত্তর দিয়েছিল, 'আমারও।'

'তবে চ না, একদিন যাই!'

চাঁদ বলেছিল, 'রাজবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে রাজা-রানি আর রাজকন্যাকে দেখা অত সহজ কাজ নয়! চারদিক ঘিরে রেখেছে প্রহরী। সিংদরজায় পাহারাদার সারাক্ষণ নজর রাখছে। হুকুম নেই যার-তার ঢুকে পড়ার।'

অলি অবাক হয়। বলে, 'তবে কি রাজকন্যা অন্ধ যেমন, তেমনই কি বন্ধঘরে বন্দি!'

চাঁদ উত্তর দিয়েছিল, 'কে বলতে পারে সে-কথা! রাজবাড়ির অন্দরমহলের খবর আমরা জানব কেমন করে? তবে শুনেছি, মাঝে মাঝে মায়ের হাত ধরে মেয়ে অলিন্দে এসে দাঁড়ায়। সামনে বাগান। কত পাখি আসে বাগানে। মেয়ে কান পেতে পাখির মিঠে সুরের ডাক শোনে।'

দাদার কথা শুনে অলি আনন্দে অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যাবি একদিন?'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করেছিল চাঁদ।

'ওই বাগানে।'

'আমাদের ঢুকতে দেবে কেন!' হেসে ফেলেছিল চাঁদ।

অলি হতাশ স্বরে বলেছিল, 'তা-ও তো বটে! আমরা তো পাখি নই!'

চাঁদ বলেছিল, 'পাখিদের খুব মজা, না রে? আকাশটা যেমন তাদের দখলে, তেমনই গাছও তাদের বন্ধু।'

অলি দাদার কথা শুনে বলেছিল, 'আর কিছু না, নিদেন আমরা যদি গাছও হতুম!'

চাঁদ অবাক হয়েছিল অলির কথা শুনে। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করতিস গাছ হলে?'

অলি উত্তর দিয়েছিল, 'রাজকন্যা যখন মায়ের হাত ধরে অলিন্দে এসে দাঁড়াত, আমরা দু-চোখ ভরে দেখতুম।'

অলির কথা শুনে চাঁদ হো-হো করে হেসে উঠল। তারপরে বলল, 'গাছ হলে কিন্তু এক-পাও নড়তে পারতিস না। এই যে ছুটে ছুটে খেলা, এই যে পাহাড়ের মাথায় উঠে বাতাসের সঙ্গে লুটোপুটি খেয়ে গানের সুরে মেতে ওঠা, সেসব কিচ্ছু হত না। উলটে, বাতাস যদি হালকা হাওয়ায় না ভেসে ভয়ংকর ঝড় হয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিত, তখন কে বলতে পারে, মাটি উপড়ে আমাদের জীবন শেষ হত না! তবে হ্যাঁ, রাজকন্যা অলিন্দে এসে দাঁড়ালে, বাগানঘেরা পাঁচিলের বাইরে থেকে দেখা যেতে পারে তাকে।'

কথাটা একদম সত্যি বটে! তাই দাদার এই কথা শুনে, দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য একটা কথা হঠাৎ যেন ঝলকে উঠেছিল অলির মনে। সে উছলে উঠে দাদাকে বলেছিল, 'তাহলে তো আমরা একটা কাজ করতে পারি!'

চাঁদ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কাজ?'

‘বাগানঘেরা পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা তো ওত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। কে বলতে পারে, বরাতের জোর থাকলে রাজকন্যাকে আমরা দেখেও ফেলতে পারি।’

অলির কথা শুনে চাঁদ মৃদু হাসল। হাসতে হাসতে বলল, ‘অলি তোর কথাটা অনেকটা ঠিক, আবার অনেকটা ঠিক নয়। বাগানঘেরা পাঁচিলের বাইরে দাঁড়ালে অলিন্দটা নজরে পড়ে বটে, তবে কতক্ষণ ওই অলিন্দের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে রাজকন্যাকে দেখা যাবে, সেটা তুইও জানিস না, আমারও জানা নেই। তাহলে তো সেই সকাল থেকে হাঁ করে অপেক্ষা করতে হয়!’

‘তাহলে?’ হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করল অলি।

‘ভাবতে হবে।’ উত্তর দিল চাঁদ। তারপরে দু-ভাই-বোন ভাবতেই বসল।

আনন্দের কথা এই যে, বেশিক্ষণ ভাবতে হয়নি তাদের। আচমকা একটা জুতসই বুদ্ধি চাঁদের মগজ থেকে বেরিয়ে এল। চাঁদ খুশিতে উচ্ছল হয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, ‘হয়েছে!’

ঠিক ততটাই ব্যস্ত হয়ে অলি জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে?’

চাঁদ বলল, ‘গান।’

‘গান!’

‘হ্যাঁ, আমরা বাগানের পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াব। তুই গান গাইবি। আমি অলিন্দের দিকে নজর রাখব। হয়তো তখন রাজকন্যা অলিন্দে এসে দাঁড়াতেও পারে তোর গান শোনার জন্যে। হয়তো তখন আমাদেরও দেখা হয়ে যাবে রাজকন্যাকে!’

দাদার মতো অতটা খুশির আলো অলির চোখে দেখা গেল না। লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। দোমনা হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আমার গান যদি রাজকন্যার ভালো না লাগে?’

‘তোর গান সবার ভালো লাগে। ভাবছিস কেন রাজকন্যার ভালো লাগবে না! চেষ্টা করতে দোষ কী।’ উত্তর দিল চাঁদ।

দাদার কথা শুনে চুপ করে গেল অলি। মনে মনে ভাবল, দাদার কথাই সই। চেষ্টা করতে দোষ নেই। সুতরাং চাঁদ আর অলি রাজবাড়ির পাঁচিলঘেরা বাগানের দিকে হাঁটা দিল।

সত্যি বটে, বাগানে পাখি আসে কত। কত পাখির কত গান রোজ শুনতে পায় রাজকন্যা। কিন্তু পাখি দেখতে কেমন তা সে জানতে পারে না। সত্যি বটে, কোন ফুলটার কেমন গন্ধ তার জানা আছে। কিন্তু কোন ফুলটা দেখতে কেমন সেটি তার জানা নেই। তাই অলি যখন দাদার হাত ধরে রাজবাড়ির পাঁচিলঘেরা বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠল-

আমি ফুল নই, আমি পাখি নই
আমি অলি, দাদা চাঁদ,
দেখা পেতে চাই রাজকন্যার
এই মনে বড়ো সাধ।
শুনেছি কন্যা রূপসি কত না
শুধু চোখে নেই আলো,
আহা যদি আমি জানতাম জাদু
তবে কত হত ভালো!
জাদুবলে রাজকন্যার চোখে
ছড়িয়ে দিতাম বিভা,
তখন না-জানি আরও কত রূপ
উছলে উঠত কী-বা!

সেই গান শুনতে পেয়েছিল রাজকন্যা। শুনতে পেয়েছিলেন রানি, রাজাও। গান থামলে রাজকন্যা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে গান গাইছে মা? কী ভালো! কোথায় সে? তাকে ডাকো না! আমি আরও শুনব।' আবদার করল মেয়ে।

মা উত্তর দেওয়ার আগেই রাজা গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ডাকব।' বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে গেলেন। নিজের মহালে গিয়ে ডাক দিলেন মন্ত্রীকে। অসময়ে মহারাজের ডাক শুনে মন্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মহারাজই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আশাকরি আপনিও শুনেছেন?'

মন্ত্রী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী শোনার কথা বলছেন হুজুর?'

রাজা বিরক্ত হলেন। বললেন, 'আপনাদের কানে কি কিছুই সেঁধোয় না। রাজবাড়ির বাগানের পাঁচিলের বাইরে একটি মেয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে আমার মেয়েকে গান শোনাচ্ছিল, আর তার দাদাটা পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছিল, এটা আমার কানে ঢুকল, চোখে পড়ল, এমনকী মহারানিও দেখলেন, রাজকন্যাও শুনল, অথচ আপনি কিছুই জানেন না! আশ্চর্য!'

মহারাজের কথা শুনে মন্ত্রী হাঁফ ছাড়লেন এতক্ষণে। হেসেও ফেললেন। বললেন, 'ও, আপনি গান শোনার কথা বলছেন? তা, কানে এসেছে। একটি ছোট্ট মেয়ের গলা। বেশ ভালোই গাইছিল। তবে তার সঙ্গে দাদা ছিল, কি ছিল না, তা বলব কেমন করে? সে নিয়ে অকারণে ভাবতে যাব কেন? কানে গান ভেসে আসছিল, এই পর্যন্ত ব্যাস! সে-গান রাজকন্যা শুনছে, কি আপনি অথবা মহারানিও এ আমি খেয়ালও করিনি।'

এবার মহারাজের মেজাজ গেল বিগড়ে। তিনি মন্ত্রীকে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'সে তো আমি জানি, আপনারা কেউ কিছুই খেয়াল রাখেন না। আমার এত বড়ো রাজ্যের তদারকির ভার আপনাদের সকলের। আপনি তার প্রধান। রাজবাড়ির বাইরে বাগানের পাঁচিলের ধারে একটি মেয়ে গান গেয়ে সকলকে জানান দিচ্ছে, আমার মেয়ের চোখে আলো নেই, জাদু জানলে সে-ই আলো এনে দিত, এটা শুনতে আমার ভালো লাগার কথা কি? তার মানে আমরা সব অকম্মা। ছিঃ! এর বাড়া আর কী অপবাদ দেওয়া যায় আমাকে?'

মন্ত্রী এবার একটু রুষ্ট হলেন। বললেন, 'আমি তো গানের কথাগুলো তেমন মনোযোগ দিয়ে শুনিনি, সুরটাই শুনেছি। এমন কথা বলে থাকলে সে তো খুবই অন্যায়!'

মহারাজ বললেন, 'আপনি ছেলে আর মেয়েটাকে ধরে আনুন!'

'এক্ষুনি ধরে আনছি,' বলে, মন্ত্রী ছুটলেন।

রাজা রেগে টং হয়ে বসে রইলেন।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে হল না রাজাকে। মুহূর্তের মধ্যে মন্ত্রীর সঙ্গে দু-জন প্রহরী চাঁদ আর অলিকে পাকড়াও করে রাজার সামনে এনে দাঁড় করাল। চাঁদ আর অলি এই প্রথম রাজার মুখোমুখি হয়েছে। এই প্রথম রাজাকে এত কাছ থেকে দেখছে। কাজেই তাদের চোখে অবাক চাউনি!

রাজা রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই, তোরা কে রে?'

চাঁদ উত্তর দিল, 'আমার নাম চাঁদ, আর এই আমার বোন অলি।'

‘কোথায় থাকিস?’

‘পাহাড়তলিতে।’

‘সেখান থেকে এখানে এসে গান গাইছিস! তোদের সাহস তো কম নয়! জানিস, এটা রাজবাড়ি?’ রাজা ধমক দিলেন।

আশ্চর্য, ধমক খেয়ে ভয় পেল না অলি! উলটে সহজ গলায় বলল, ‘রাজামশাই, আমরা আপনাকে আজই প্রথম দেখলুম। তেমনই রানিমাকেও দেখিনি কোনোদিন, রাজকন্যাকেও না। ভেবেছিলুম, বাগানঘেরা পাঁচিলের বাইরে দাঁড়িয়ে গান গাইলে রাজকন্যা গান শুনতে পাবে। মায়ের হাত ধরে অলিন্দে এসে দাঁড়াবে। জানি, রাজকন্যা আমাদের দেখতে পাবে না। কিন্তু আমরা তো তাকে দেখতে পাব।’

রাজা তেমনই রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী করে জানলি তোরা রাজকন্যা তোদের দেখতে পাবে না?’

‘এ-কথা তো সবাই জানে রাজকন্যার চোখে আলো নেই,’ উত্তর দিল অলি, ‘আহা, আমার যদি জাদুমন্ত্র জানা থাকত, তবে সেই মন্ত্র পড়ে আমি ঠিক রাজকন্যার চোখ আলোয় উছলে দিতুম।’

‘হ্যাঁ, তোর গানে আমি এ-কথাও শুনেছি। কিন্তু তুই কেমন করে জানলি জাদুমন্ত্রে চোখের আলো ফিরে আসে?’ এবার রাজার গলায় ততটা রাগ নেই।

অলি উত্তর দিল, ‘সবাই বলে।’

‘জানিস সে-মন্ত্র কোথায় পাওয়া যায়? কোথায় আছে জাদু?’ রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

অলি বলল, ‘তা তো আমি জানি না।’

রাজা এবার দৃঢ় গলায় বললেন, ‘তোকে জানতে হবে। তোকেই সে জাদু খুঁজে আনতে হবে যেখান থেকে পারিস। নইলে রেহাই নেই। কেননা, নিয়ম ভেঙে গান গেয়েছিস তুই। তোর দাদা নয়। তবে, তোর দাদাও রেহাই পাবে না। কেননা, সে-ই যে তোকে বুদ্ধি দিয়েছে, এ আমি বুঝতেই পারছি। সুতরাং তুই যতদিন না খুঁজে আনছিস জাদু, ততদিন তোর দাদাও থাকবে আমার হাতে বন্দি। এই আমার হুকুম।’

আর কিছু করার নেই। রাজার হুকুম মানতেই হবে। যতই কাকুতিমিনতি কর, সে-হুকুম ঠেকানো যাবে না। অগত্যা অলি দাদাকে রাজবাড়িতে রেখে

বেরিয়ে পড়ল একা জাদুমন্ত্রের খোঁজে। তার চোখ ছলছল। আর, তার দাদা চাঁদ, বন্দি হল রাজার হাতে রাজবাড়িতে। তার মন ভেঙে খানখান।

কিন্তু অলি ওই তো মেয়ে ওইটুকু। সে এখন একা একা কোথায় যাবে? কোথায় জাদু খুঁজে পাবে? জানে না কিছুই। কী কুক্ষণেই না রাজার কাছে জাদুমন্ত্রের কথা উচ্চারণ করেছিল! দাদা ছাড়া সে কোনোদিন একলা পথে হাঁটেনি। আজ তার এ কী বিপদ! বিপদই তো বটে! একটা ছোট্ট মেয়েকে এমন করে বিপদে ফেলতে রাজার একটুও মন কেমন করল না! রাজারা কি এমনই নিষ্ঠুর হয়! ভাবতে ভাবতে অলির চোখ ভেসে যায় কান্নায়। তবু সে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, কোথায় যাবে সে, কোনদিকে! কাকে জিজ্ঞেস করবে সে, কোথায় জাদু!

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেল অলি। আর যেন সে পারছে না। সামনে নদী। হাওয়া ঝিরঝির বইছে। নদী তিরতির ছুটছে। ইচ্ছে হল অলির খানিক নদীর তীরে বসে! হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত মেয়েটা, ইচ্ছে হল বলেই নদীর তীরে বসল। এপার ওপার নদীর ঢেউ উছলে ওঠে ছলাৎ ছলাৎ, দেখতে লাগল।

আশ্চর্য, কেউ কোথাও নেই কোনোখানে এদিক-ওদিক, অথচ কে যেন মিষ্টি স্বরে ডাকল, 'ও মেয়ে তোর জল কেন রে চোখে? কে বকেছে? আনমনে বসে আছিস?'

চমকে উঠল অলি। এদিক-ওদিক খুঁজল। দেখতে পেল না কাউকে। তবে কে কথা কইল!

আবার অন্য স্বরে অন্য কেউ বলে উঠল, 'অমন করে এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছ কেন? আমরা তোমার চোখের সামনেই আছি।'

'এই তো দেখো উছলে উঠে নাচছি।'

'পড়ছি আবার উঠছি।'

'আমরা নদীর ঢেউ।'

'কী হয়েছে তোমার?'

'ঢেউ!' অবাক হল অলি। বলে উঠল, 'আমি তো আর শুনিনি আগে, নদীর ঢেউ কথা কয়!'

অলির কথা শুনে একটা ঢেউ ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠে কলকলিয়ে বলে উঠল, 'আমরা যে জাদু জানি, কথা বলার জাদু।'

অলি আস্তব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা জাদু জান! আমি যে জাদুই খুঁজছি! রাজার মেয়ে অন্ধ। রাজার মেয়ের চোখে জাদুর বলে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে না পারলে আমার দাদার মুক্তি নেই। দাদাকে রাজা বন্দি করে রেখেছেন। আমাদের দোষের মধ্যে কী, না, আমি গান গেয়েছি রাজবাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে। লুকিয়ে রাজকন্যাকে দেখব বলে। তোমরা বলতে পার, কোথায় পাব সেই জাদু রাজকন্যার চোখের আলোর।'

অলির কথা শুনে নদীর সমস্ত ঢেউ একসঙ্গে নেচে উঠল। কলস্বরে বলে উঠল, 'সে জাদু কোথায় আছে আমরা জানি।'

অলি হাঁকপাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আছে?'

'আমাদের বুকে।' উত্তর দিল ঢেউয়ের দল।

অলি অস্থির হয়ে আবদার করল, 'আমাকে দাও না!'

'আমরা দিতে পারি না। তোমাকেই নিতে হবে।'

'কেমন করে নেব?'

'আমাদের বুকে নেমে। জলের তল থেকে।'

'আমি যে ডুবে যাব।' ভয় পেল অলি।

'তুমি ডুবলেই পাবে জাদু। সে-জাদু জলে ভাসে, ডাঙায় হাঁটে। আকাশে উড়তে পারে। সে-জাদুর নাম উড়ন্ত মীন। তুমি ডুবলেই সে-জাদু আমাদের বুক থেকে আকাশে উড়ে যাবে। উড়তে উড়তে চলে যাবে রাজবাড়ি সবার অজান্তে। তারপর রাজকন্যার ঘরে ঢুকে, ঘুমন্ত রাজকন্যার কপালে চুমো দেবে। তখন দেখবে কী হয়!'

অলি স্থির থাকতে পারে না। আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলেই রাজকন্যার চোখের অন্ধকার কেটে আলো ফুটে উঠবে? আমার দাদা মুক্তি পাবে?'

ঢেউয়ের দল উত্তর দিল, 'তেমনই তো কথা।'

অলি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কী হবে? আমি কি ডুবে থাকব জলের তলায়? আমার দাদাকে আর দেখতে পাব না কোনোদিন?'

'সে-কথা তো পরের কথা। কী হয় পরে, সে শুধু জাদুই বলতে পারে।' ঢেউয়ের দল একসঙ্গে বলে উঠল।

না, অন্য আর কিছু ভাবল না অলি। দাদাকে রাজার বন্দিশালা থেকে মুক্ত করতে হলে, তাকে নদীর জলে ডুবতেই হবে। কাজেই আর কথা বাড়াল না অলি। নদীর জলে নেমে পড়ল। ঢেউয়ের সঙ্গে দোল খেতে খেতে টুপ করে ডুবে গেল জলের গভীরে। আর তাকে দেখা গেল না।

একটু পরেই দেখা গেল সাদা ধবধব করছে একটা মাছ, নদীর জলে ভাসতে ভাসতে সাঁতার কাটছে। দু-পাশে তার পাখনা। তারপরেই আচমকা সে সাঁতার ছেড়ে আকাশে পাখা মেলল। পাখনা মেলে উড়তে লাগল। উড়তে উড়তে আকাশে কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর দেখা গেল না তাকে।

দেখা গেল পরের দিন ভোরের আলোয়, রাজবাড়ির মিনারে সে বসে আছে। সূর্য উঠব উঠব করতেই সে পাখা মেলে উড়ে মিনার ছেড়ে রাজবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে ঢুকে পড়ল রাজকন্যার শয়নঘরে। রাজকন্যা তখনও সোনার খাটে, মখমলের বিছানায় ঘুমোচ্ছে। হয়তো একটু পরেই ঘুম ভাঙবে। তার আগেই সেই পাখনামেলা সাদা ধবধবে মাছটা রাজকন্যার কপালে একটি চুমো দিল। ওমা! এ কী কাণ্ড কোথা গেল সেই সাদা ধবধবে মাছ! চুমো দিতেই এ যে দেখি সেই সাদা মাছ অলি নিজেই।

চমকে উঠল রাজকন্যা। ভেঙে গেল তার ঘুম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলতেই আলোয় আলোয় ভেসে উঠল তার চোখের তারা। ধড়ফড় করে উঠে পড়ল রাজকন্যা। যেদিকে চায় দেখতে পায় আলো আর আলো। দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, ছোট্ট। তার ঘরভরতি নানান রঙের কত আসবাব। কী সুন্দর! দেখছে ছবি, দেখছে ফুল। দেখছে নিজের সাজপোশাক। দেখতে দেখতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবার সে নিজেকে দেখতে পেয়ে তারস্বরে ডাক দিল, 'মা-আ-আ! বাবা-আ-আ!

রাজকন্যার ডাক শুনে ছুটে এলেন রাজা-রানি হন্তদন্ত হয়ে। ছুটে এল রাজবাড়ি ভরতি যত মানুষ। তারা রাজকন্যার চোখে আলো দেখছে। আর দেখছে রাজকন্যা অলি নামের একটি ছোট্ট মেয়ের গলা জড়িয়ে আদর করছে। আনন্দে তোলপাড় হয়ে গেল সারা রাজবাড়ি। তারপর?

মুক্তি পেয়েছে চাঁদ বন্দিশালা থেকে। দাদাকে দেখে আনন্দে দিশেহারা হয়ে ছুটে গেছে অলি দাদার কাছে। উৎসব শুরু হয়ে গেল রাজবাড়িতে চাঁদ আর অলিকে নিয়ে।

হ্যাঁ, এতক্ষণে দাদার কানের কাছে মুখ এনে অলি চুপিচুপি বলল, ‘জানিস দাদা, একেই বলে জাদু!’

দাদা হাসল। তবে তা মুচকি হাসি। রাজারাজড়াদের সামনে কি হো-হা করে হাসতে আছে! ছিঃ!

নীল পালক

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ওটা কী পড়ল রাস্তায়, এই মাত্তর!

খসে পড়ল একটি পালক। আকাশে উড়ে যাচ্ছিল একটি নীল পাখি, তারই ডানার নীল পালক!

রাস্তায় এমন তো কত কী পড়ছে। পাখির পালকও পড়ছে, গাছের পাতাও পড়ছে। ছেঁড়াকুটো কাগজও পড়ছে, কাগজের ফুলও পড়ছে। অভাব নেই মানুষজনেরও। এমনকী গাড়িঘোড়ারও। এইসব ঝড়তিপড়তি আবর্জনার দিকে কে আর নজর দেয়। কারই-বা চোখে পড়ে। তবে হ্যাঁ, মনকাড়া যদি কিছু পড়ে থাকে রাস্তার এককোণে তখন অন্যকথা। সেদিকে নজর পড়লে কে না হাত বাড়ায় সেটি তুলে নেবার জন্য।

যাক গে, ওসব কথা থাক। ফেলনা জিনিসের আদর না থাকলে কী হয়েছে, ওই কাগজের ফুলটার কিন্তু দেমাক ভারি। সে যে ফুল, সেই গর্বেই সে গেল! সে যে রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। ধুলোয় মাখামাখি হয়ে এমন দশা হয়েছে সেই কাগজের ফুলের যে, তাকে আর ফুল না বলে জঞ্জাল বলাই ভালো। তা, সে-কথা কে আর মানে!

সেদিন হল কী, একটা চাঁদিয়াল ঘুড়ি ভোঁকাট্টা হয়ে পড়ল রাস্তায়। পড়বি তো পড় ফুলটারই ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অমনি পাঁচ-ছ-টা ছেলে ছুটে এল ঘুড়িটাকে ধরবার জন্য। একজন ধরলও বটে! কিন্তু আর ক-জন এমন কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিল যে, আস্ত ঘুড়িটাই ফড়াৎ ফর্দাফাঁই! তারপর শুরু হয়ে গেল ঝগড়া। তা, হাত থাকতে মুখোমুখি, সে কী আর বেশিক্ষণ চলে! সুতরাং লেগে গেল হাতাহাতি! সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

তা বলতে নেই, কিল-ঘুসি, চড়-চাপড় সবই হল। পথচলতি দু-চারজন মানুষ ধমক-ধামক দিয়ে মারামারিটা থামিয়ে দিলেন! মারামারি থামল বটে, কিন্তু কথা কাটাকাটি থামল না। এ-ওকে চোখ রাঙিয়ে, হাত পাকিয়ে চ্যাঁচামেচি করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল। পড়ে রইল ছেঁড়া ঘুড়ির ফাটা কাগজ।

এমন সময় কোথাও কিছু নেই, সেই কাগজের ফুলটা খেঁকিয়ে উঠল। ছেঁড়াফাটা ঘুড়িটাকে বলল, ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল। আমার ঘাড়ে পড়লে

এই দুর্দশাই হয় সবার। জানিস আমি ফুল। সবাই আমায় কত খাতির করে!'

কিন্তু বেচারি ছেঁড়াফাটা ঘুড়ি। সে তো আর কথা বলতে পারে না। কিন্তু ফুলের কথাটা শুনতে পেয়েছিল একটা কদম গাছের ঝরা পাতা। সে উত্তর দিল, 'অত গুমর না দেখানোই ভালো। তুমি ফুল হতেই পার। তবে গাছের নয়, হাতের। মানুষ তোমায় হাতে গড়েছে। তুমি আমার মতো গাছে জন্মাওনি।'

ফুলটা তেমনই কুঁদুলেপনা করে বলল, 'তুই তো ক-দিন পরে শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে মরবি। আমার ওসব ভয় নেই। জানিস তো আমি চিরদিন বেঁচে থাকব।'

পাতা বলল, 'চিরদিন কেউ বাঁচে না। তুমিও মরবে। এক্ষুনি গুড়ুগুড়ু মেঘ ডেকে যদি ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নামে, তখন দেখব তুমি কোথায় থাক। জলে ভিজে ন্যাতা হয়ে গেলে, তখন আর তোমায় কেউ ফুল বলবে না, বলবে কাগজের ডেলা।'

বলতে নেই, কদম পাতা আর ফুলের মধ্যে অনেক তর্কাতর্কি হল, ছেলেদের ঘুড়ি কাড়াকাড়ির মতো, মারামারি হল না। হঠাৎ সেই কাগজের ফুল চমকে উঠল সেই নীল পালকটা দেখে! যতই হোক পাখির ডানা থেকে সদ্য সদ্য খসে পড়া পালক সে তো ঝলমল করবেই! কিন্তু নীল ঝলমল সেই পালকটা যে কাঁদছিল, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। এমন নয় যে, ফুলটা তা দেখেনি। ঠিকই দেখেছে। দেখে, কোথায় জিজ্ঞেস করবে, কী হয়েছে তার, তা নয় মুখ ঘুরিয়ে নিল। নিজের মনে গজগজ করে বলে উঠল, 'আবার একটা আপদ এল।'

আসলে, হিংসে হলে যা হয় আর কী! নিজে তো ধুলোয় নোংরা হয়ে গড়াচ্ছে, আর নীল পালকটা ঝকঝক করছে, তা-ই দেখে ফুলের মেজাজ টং।

দেখতে ভুল করেনি কদম গাছের পাতা। যেমন সে নীল পালকটাও দেখেছে, তেমনই ফুলের উথলে-পড়া হিংসুটে চেহারাটাও দেখেছে! তা পাতাটা ভালো বলতে হয়। সে নরম গলায় পালককে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাঁদছ কেন ভাই?'

পালক উত্তর দিল, 'না কেঁদে আমি যে থাকতে পারছি না। এতদিন আমি ছিলুম নীল পাখির নীল পাখনার নীল পালক। গাঁথা ছিলুম পাখির

গায়ে আমার আরও অনেক বন্ধুর সঙ্গে। আকাশে আকাশে পাখনা ছড়িয়ে সবাই মিলে কোথায় না গেছি! শীতের দিনে এদেশ ছেড়ে উড়ে গেছি আর এক দেশে। দেখেছি, কত পাহাড়, নদী, সমুদ্র, দেখেছি কত অরণ্য!'

কদম পাতা অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এতসব দেখেছ? আমরা তো এসবের নামই শুনিনি কখনো!'

কাগজের ফুল কদম পাতার কথা শুনে খ্যাঁক করে উঠল, 'তুই এসবের নাম শুনবি কী করে? এসব থাকলে তবে তো শুনবি। এসব ওই পালকটার মনগড়া কথা। ভেবেছে, দু-ফোটা চোখের জল ফেললেই বুঝি আমরা গলে যাব। আমরা ওকে বন্ধু করে নেব। অত না।' তারপর পালকটাকে বলল, 'গায়ে পড়ে ভাব করতে আসবি না। মিথ্যে মিথ্যে গল্পকথা শোনাবি না।'

ফুলের কথা শুনে নীল পালক আর একটি কথাও উচ্চারণ করল না। শুধু মনের দুঃখ মনে চেপে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আর দেখতে লাগল আকাশ জুড়ে কত পাখি উড়ছে, ডাকছে। কেমন নরম পালক হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

নীল পালক কথা বলল না বটে, কিন্তু কদম পাতা ছাড়ল না। কাগজের ফুলকে যাচ্ছেতাই করে কথা শুনিয়ে দিল। বলল, 'তুমি বড্ড একলষেঁড়ে। নিজেরটি ছাড়া আর কিছু জান না। আমি কদম গাছের পাতা। আমার সময় হয়েছে বলে আমি গাছ থেকে খসে পড়েছি। কিন্তু গাছের আগডালে যখন ছিলুম, তখন যতদূর চোখ যেত, কত কী দেখতুম। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য দেখিনি বটে, কিন্তু দেখেছি সবুজ খেত, ছোট্ট নদী, ফুলের বাগান। বাগানে ফুলের মেলা, কত রকমের রং ঝলমলে ফুল বাগানভরতি।'

কাগজের ফুল ভেংচি কেটে বলল, 'সেসব ফুল তো রোদের তাপে শুকিয়ে মরে। আমি তো কোনোদিন কারও মতো শুকিয়ে মরব না।'

কদম পাতা উত্তর দিল, 'বললুম তো বৃষ্টির জলে ভিজে মরবে।'

ফুল বলল, 'দেখবি, দেখবি, আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরার আগেই কেউ-না-কেউ আদর করে আমায় ঘরে নিয়ে যাবে! ঘরের ভেতর আমায় সাজিয়ে রাখবে। তুই ড্যাবড্যাব করে দেখবি, আর হিংসেতে জ্বলে মরবি। তারপর একদিন যখন শুকিয়ে খরখরে হয়ে যাবি, কাঠকুড়ুনি তোকে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। উনুনের আগুনে ফেলে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে! আর ওই পালকটার গায়ে ধরবে পোকা! দুর্গন্ধে হাঁসফাঁস করে নাকে কাপড় দেবে মানুষে!'

কাগজের ফুলের দেমাক দেখে নীল পালক তো আগেও চুপ করে গিয়েছিল। এবার কদম পাতাই আর কথা বাড়াল না। চুপ করে রইল।

ঠিক এই সময়েই এক কাণ্ড ঘটল। এদিকেই ছুটে আসছে একটা টাট্টু ঘোড়া টগবগ করে। তার পিঠে বসে আছে একটা ছেলে। হয়তো তোমাদের মতো সে বড়ো হবে, নয়তো ছোটো। হয়তো ঘোড়াটা তারই। কেমন ঘাড় তুলে ঘোড়াটা ছুটে আসছে। কী সুন্দর দেখতে লাগছে। তা বলতে কী, ঘোড়াটা দেখতেও ভারি চমকদার। গায়ের বাদামি রংটা যেমন ঝকমক করছে, তেমনই চোখ দু-টিও চকচক করছে।

কী জানি কেন, ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে দাঁড়াল এখানেই। ঘোড়সওয়ার ছেলেটাই দাঁড় করাল। সে নেমেও পড়ল ঝটপট ঘোড়ার পিঠ থেকে। সে বোধ হয় দেখতে পেয়েছে ওই কাগজের ফুলটাকে। তার ঘোড়ার মাথায় সে সাজিয়ে রেখেছে কাগজের রঙিন ফুলের তাজ। বোধ হয় তার ইচ্ছে হয়েছে, ওই ফুলটিও সে ঝেড়েপুঁছে গেঁথে দেবে ওই তাজে। তাই সে দৌড়ে গেল ফুলটা ধুলো থেকে তুলে নেবার জন্য। তুলে নিলও। কিন্তু পছন্দ হল না তার। হবার কথাও নয়। ফুলটা ধুলোয় এমন নোংরা হয়ে গেছে যে, ওই ঘোড়ার মাথায় সাজানো তাজের ফুলের পাশে এটা এক্কেবারে বেমানান লাগবে। কাজেই সে ‘ধুত’ বলে ছুড়ে ফেলে দিল। পড়বি-তো-পড় ফুলটা গিয়ে পড়ল সেই নীল পালকটার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার চোখ পড়ে গেছে পালকটার দিকে। সে তুলে নিল পালকটা ঝট করে। নীল ঝলমলে টাটকা পালকটা দেখে নিজের মনে হাসল সে, ভাবল ঘোড়ার মাথার তাজে রঙিন ফুলের মধ্যিখানে পালকটা গেঁথে রাখলে দারুণ লাগবে।

ছেলেটা করলও তাই। সত্যি, দেখতেও লাগছে দারুণ। ছেলেটা সেখান থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেও গেল তক্ষুনি। পড়ে রইল কাগজের ফুল আর কদম গাছের পাতা।

কাগজের ফুল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ছুটন্ত ঘোড়টার দিকে। কদম পাতা মুচকি মুচকি হেসে কাগজের ফুলকে জিজ্ঞেস করল, 'বুঝলে কিছু?'

কাগজের ফুল কোনো উত্তর দিতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই রইল।

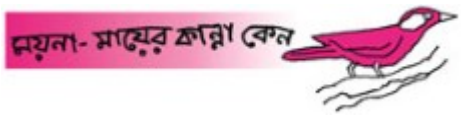

ময়না-মায়ের আজ কী হয়েছে, কে জানে। সকাল থেকে ময়না কথা কয় না, গান গায় না। গাছের ডালে উড়ে উড়ে, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে পাখিদের ডাকে না। চাই কী, পাকা ফলের গন্ধ পেয়ে ছোটে না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে ডালের বাসায় বসে বসে শুধু কাঁদে। বুকের কাছে টেনে ছানাটার মুখের দিকে যতই তাকায়, ততই যেন কান্না তার উপচে ওঠে। বলি, ব্যাপার কী! অন্য দিন তো এমন হয় না। অন্য দিন ভোর হতে-না-হতেই ময়না-মায়ের ঘুম ভেঙে যায়। গাছের ডালে গান জুড়ে দেয়। তারপর ফুড়ুৎ করে উড়ে যায় পাকা ফলের গাছে গাছে। ঠুক ঠুক ঠোঁট ঠুকরে ফল খায় আর তুড়ুক তুড়ুক নাচ করে। ভোরের আলোয় সে কী মজা! কাজেই আজ যে তার কান্না শুনে সবার অবাক লাগবে, এ আর এমন কথা কী!

ময়না-মায়ের কান্না শুনে কাঠবিড়ালি-খুড়ো গাছের কোটর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল। তার চোখে-মুখে তখনও ঘুমের আমেজ। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল কী? ময়না-মা কাঁদছ কেন?'

কাঠবিড়ালিকে দেখে ময়না-মা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। চোখের ওপর ডানার আড়াল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে দিল। মায়ের কান্না দেখে ছানাটা দু-বার কিঁচ কিঁচ করে উঠতেই মা তাকে বুকে টেনে নিল। ছানাটার এই তো সবে ক-দিন হল চোখ ফুটেছে। এরই মধ্যে কি আর মুখে কথা ফোটে!

কান্না দেখে কাঠবিড়ালি-খুড়ো তো থ। তাই আবার বলল, 'সাতসকালে তোমার কান্না, এ তো ভাবাই যায় না। তুমি গান শুনিয়ে যাদের ঘুম ভাঙাও, আজ তাদের কেন কান্না শোনাও, কী হয়েছে বলো দিকিনি?'

'আমার অদৃষ্টের কথা শুনে তোমরা কী করবে বল?' ময়না-মা ডুকরে ডুকরে বলে উঠল।

'কেন? শুনি, ব্যাপার কী?'

ময়না-মা তখন কান্নাটাকে গলায় সামলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'কাল রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বাদুড়-বুড়ো গায়ে ঠেলা দিচ্ছে। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে জিজ্ঞেস করি, 'বাদুড়-বুড়ো, এই রেত-বিরেতে ঘুম ভাঙাও কেন?'

বুড়ো বলল, 'ভীষণ বিপদ। তোমার ছেলেকে গাছের নীচের গেছো ইঁদুর ধরে নিয়ে যাবার মতলব করেছে।'

কাঠবিড়ালি-খুড়োর মাথায় যেন ভোঁ-চক্কর লেগে গেল। ময়না-মায়ের বাসার কাছে বেশ খানিকটা ছিটকে এসে বলে উঠল, 'অ্যাঁ, তাই নাকি!'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমার কী হবে খুড়ো? আমার একটি ছেলে। তা ও গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব।' বলে এবার জোরে কান্নার সুর তুলল ময়না-মা।

'আরে চুপ, চুপ।' কাঠবিড়ালি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'অমন করে কাঁদলে কোনো কাজই হয় না। বরং আমায় একটু ভাবতে দাও! দেখো, গেছো ইঁদুরের সঙ্গে গাজোয়ারি করে কে পারবে! সে কম্ম সোজা নয়। তবে অন্য কিছু করা যায় কি না! সেইটাই এখন ভাববার।'

ময়না-মা এবার সুর নামিয়ে কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই খুড়ো। তুমি যেমন করে পারো আমার ছেলেটাকে বাঁচাও। আমি চিরদিন তোমার ল্যাজ-ধরা হয়ে থাকব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি একটু শান্ত হয়ে ছেলেটার ওপর নজর রাখো। দেখি, আমি কী করতে পারি।' বলে কাঠবিড়ালি চলে গেল নিজের কোটরে।

একটু পরেই সেজেগুজে কাঠবিড়ালি বেরিয়ে পড়ল। একটু পরেই হাজির হল, গেছো ইঁদুরের ঘরের দোরে।

'আরে, আরে, খুড়ো যে! বলি, ব্যাপার কী? একেবারে সক্কালবেলা গরিবের ঘরে?' বলে গেছো ইঁদুর আপ্যায়ন করে কাঠবিড়ালিকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

খুড়ো বলল, 'হ্যাঁ ভাই, সক্কালবেলাই এসে পড়লুম। না এসে উপায়ও ছিল না। ভীষণ বিপদ।'

ইঁদুর জিজ্ঞেস করল, 'বিপদ, কীসের বিপদ?'

'আর বল কেন ভাই,' খুড়ো ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে শুরু করল, 'আমাদের তো এখন গাছে টেঁকাই দায়।'

'কেন? কেন?'

'তুমি তো জানো, আমাদের গাছে একটা ময়না বাসা বেঁধেছে। উফ, তার জ্বালায় আমরা সবাই অতিষ্ঠ। সকাল থেকে রাত অবধি খালি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে গান, ক্যাঁক-ক্যাঁক করে হাসাহাসি, নাচানাচি, অসহ্য। আচ্ছা, সে-

ও না-হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ক-দিন হল তার একটি ডিম ফুটে ছানা হয়েছে। সেই ছানা যে কী কাণ্ড করছে, সে তোমায় কী বলব। দিন নেই, রাত নেই তিনি ট্যাঁ-ট্যাঁ করেই যাচ্ছেন। কান গেল দাদা, একেবারে গেল। আমার ছেলে-মেয়েগুলো যে দু-দণ্ড বই নিয়ে বসবে, সে গুড়ে গুবরেপোকা! সব গোল্লায় গেল দাদা, সব গোল্লায় গেল। তাই তোমার কাছে ছুটে আসছি। এর একটা বিহিত তোমাকে করতেই হবে। কিছু না হোক, ওই ছানাটাকে অন্তত-‘

কাঠবিড়ালি-খুড়োর মুখের কথা শেষ হবার আগেই চোঁক চোঁক, চোঁক চোঁক করে ইঁদুরটা হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে বলতে লাগল, ‘আরে এর জন্যে তোমার এত কষ্ট করে আসা? তুমি বলবে কী, তোমার বলার আগেই আমি সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি। তুমি কী আর একা অশান্তিতে আছ ভাই, আমাদেরও যে ওই একই অবস্থা। তাই আজই ময়না-মায়ের ছানাটিকে হাপিশ-‘ বলতে বলতে আবার চোঁ-ও-ও, চোঁ-ও-ও করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে আবার বলল, ‘তুমি আমার সঙ্গে থাকলে তো আর কথাই নেই। থাকবে তো?’

কাঠবিড়ালি-খুড়ো ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল, ‘সে-কথা আর বলতে। তোমার সঙ্গে না থাকলে আমাদেরই তো লোকসান। তাহলে দাদা, ছানাটাকে হাপিশ করছ কখন?’

‘কখন আবার, এখনই, এখনই।’ বলে গেছো ইঁদুর কাঠবিড়ালির পিঠে একটু আহ্লাদ করে কামড়ে দিয়ে আদুরি-গলায় বলল, ‘তুমি যখন আছ, তখন আমার ভাবনা কী!’

কাঠবিড়ালি বলল, 'সে তো ভালো কথা। তাহলে আমার সঙ্গে এখনই চলো।'

গেছো ইঁদুর আর কথা না বাড়িয়ে লাফিয়ে চলল কাঠবিড়ালির পাশে পাশে। ফুর্তিতে তার বুকখানা যেন তিড়িং-বিড়িং করে নাচছে।

খানিকটা পথ আসতেই ইঁদুরের নজর পড়ল সেই ময়না-মায়ের গাছের বাসার দিকে। কিন্তু ময়না-মায়ের চোখ পড়ল না তাদের দিকে।

ইঁদুর বলল, 'এসে তো গেছি।'

কাঠবিড়ালি-খুড়ো অমনি চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল, 'চুপ।' বলেই ঝট করে একটা ঘরের মধ্যে টেনে নিল গেছো ইঁদুরকে। টেনে নিয়েই বলল, 'তুমি এক্ষুনি সব গুবলেট করে দিয়েছিলে। অত জোরে চ্যাঁচায়! তুমি এই ঘরে একটু বসো। আমি গাছের অবস্থাটা একটু দেখে আসি।'

'বাঃ! এই ঘরটি তো বেশ। এটি কি তোমার ঘর?' এবার ফিসফিস করেই জিজ্ঞেস করল গেছো ইঁদুর।

কাঠবিড়ালি-খুড়ো উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। তবে তুমি একদম বেরিয়ো না ঘর থেকে। কেউ দেখতে পেলে সব ভেস্তে যাবে।'

'তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। আমি একদম বেরোব না।'

'বেশ, তাহলে আমি আসছি।' বলে কাঠবিড়ালি-খুড়ো ঝটপট ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে কী যে করল কে জানে, ঘরের কপাটটা খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল! উরি বাস! কী শব্দ! শব্দের চোটে চমকে ওঠে ইঁদুর। বুঝি তার পিলে ফাটে!

'এ কী হে খুড়ো, কপাট দিলে কেন?' হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করল ইঁদুর।

খুড়ো খিক খিক করে হেসে উঠল। বলল, 'কপাট নয় হে দাদা, কপাট নয়, এটি তোমার জ্যান্ত কবর। তুমি দাদা ফাঁদে পড়েছ। গাছের প্রাণীদের প্রাণে মারার মতলব যারা করে তাদের এমনি করেই ফাঁদে পড়ে মরতে হয়। এখন তুমি ওর ভেতরই পচে মরবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না।' বলতে বলতে কাঠবিড়ালি-খুড়ো গাছের ওপর তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে চ্যাঁচাল, 'বলি ও ময়না-মা, কোথায় গেলে গো? এসো, এসো, দেখবে এসো। তোমার গেছো ইঁদুরের কী অবস্থা করেছি একবার নিজের চোখে দেখবে চলো। ঝোপের মধ্যে পড়েছিল ইঁদুর-কলের বাক্সটা। কেমন কাজে লাগল দেখো।'

সত্যি, ফুড়ুৎ করে ময়না-মা উড়ে এল দেখতে। দেখতে দেখতে ময়না-মায়ের মুখে হাসি ধরে না আর।

গেছো ইঁদুর চিনচিনে গলায় কেঁদে উঠল, 'ওরে আমাকে বাঁচা রে!'

কিন্তু কে বাঁচাবে।

ময়না-মা গদগদ গলায় কাঠবিড়ালিকে বলল, 'খুড়ো, তোমাকে কী আর বলব, আর এ-ঋণ কী দিয়েই-বা শোধ করব। চলো, ঘরে একটা ডাঁসা পেয়ারা এনে রেখেছি, গালে দেবে চলো!'

ভোঁকাট্টা

বনটা খুব গভীর। তেমনই গা ছমছমে। সেই বনে একটা বাঘ থাকত। শুনে হেসে মরি, বাঘটা কোনোদিন মানুষ দেখেনি। দেখা তো দূরের কথা, কোনোদিন মানুষের নাম পর্যন্ত শোনেনি। একদিন বাঘটা করেছে কী, একটা গাছে উঠেছে। পাখির ডিম খাবে, শোনো কথা, অতবড়ো একটা গাবদা-গাবুস বাঘ সে পাখির ডিম খাবে! আরে বাবা একটা ছুন্নি গুলির মতো ডিম খেলে তোর জালার মতো পেট ভরে কখনো।

তবে, ডিম তাকে খেতে হল না। খাবার আগে যার ডিম সেই পুঁচকে পাখি তাকে দেখতে পেয়েছে। পাখি তো যাচ্ছেতাই ভাবে বাঘকে কথা শুনিয়ে দিল, ‘ছি ছি, কী লজ্জা! মানুষ খাবার মুরোদ নেই, বাঘ হয়ে তুই গাছে উঠে ডিম খাবার মতলব আঁটিস! তাও আবার আমার মতো একটা পুঁচকে পাখির ডিম।’

ব্যাস! বাঘের অপমানের একশেষ! ওইটুকুনি একটা ছোট্ট পাখি মুখ ঝামটা দিয়ে বাঘের মুখে যেন চুনকালি মাখিয়ে দিল! অপমানই তো! একটা হাতি যদি কথা শোনাত, সে তবু মানা যেত। শুনিয়ে দিল কিনা একটা পাখি! কী আস্পর্ধা! বাঘ তো রেগে কাঁই! ভেতরে ভেতরে এমন রাগান রাগল একবার পাখিটাকে যদি ধরতে পারে! ধরলে, পাখির যে কী দশা হবে সে আর কে না জানে!

অবিশ্যি বাঘ রাগল বটে, কিন্তু রাগের ছিটেফোঁটাও তার মুখে ফুটল না। উলটে টসটস করে জল গড়াতে লাগল তার নোলা দিয়ে! কেননা, মানুষের নাম শুনেই, তার খিদে পেয়ে গেল! সে আর থাকতে পারল না। ‘পাখিটাকে খাব,’ বলেই মারল লাফ গাঁক করে ডাক ছেড়ে পাখির ঘাড়ে!

হায় কপাল! বুদ্ধি দেখো বাঘের! পাখি তো ফুড়ুৎ! আর কেঁদো বাঘের ধাক্কায় গাছের ডাল ভাঙল ফটাস! বাঘটা পা ফসকে মাটিতে পড়ল ধপাস! পড়েই ধড়ফড় করে উঠে পড়েছে! তারপর দে ছুট! ওই দেখো, বাঘ লেংচে লেংচে ছুটছে! আর বলতে হবে না, বোঝাই যাচ্ছে মোক্ষম লাগান লেগেছে!

বাঘের ল্যাংচানির খবর কী আর চাপা থাকে! সেই খবর শুনে সারা বনে টিটি পড়ে গেল। বাঁদর থেকে শুরু করে গাধা পর্যন্ত এমন হাসাহাসি শুরু

করে দিল যে, লজ্জায় বাঘের মাথা কাটা যাবার গোত্তর! শেষমেষ বাঘের লুকিয়ে পড়া ছাড়া আর উপায় থাকল না।

তা বলো, ভীতুর মতো বাঘ আর ক-দিন লুকিয়ে থাকতে পারে! খিদে-তেষ্টাকে তো আর অমান্য করা যায় না। তা ছাড়া, বাঘের পক্ষে লুকিয়ে থাকাটা কি বড়াই করার মতো একটা ঘটনা! তাই বাঘ একদিন গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে যেই বেরোল অমনি তাকে নিয়ে আবার হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল! আবার শুরু হয়ে গেল টিটকিরি! বাঁদর তো একটা ছড়া বানিয়ে ফেলল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল-

একটা ছিল বাঘ

ধরতে গেল পাখি

ধরতে গিয়ে ফসকে ধপাস

ভাঙল মালাইচাকি!

ছ্যা-ছ্যা!

বাঁদরের মুখে ছ্যা ছ্যা শুনে বাঘের মুখ দেখানোই দায়! তবু বাঘ বলে কথা! বাঁদর তাকে ছ্যা-ছ্যা করবে, আর বাঘ মুখ বুজে তা সহ্য করবে এ কখনো হয়! বাঘ বাঁদরের ছ্যা ছ্যা শুনে আচমকা 'গাঁক' করে এমন একখানা ধমক দিল যে, মনে হল বনটা যেন কেঁপে উঠল! বন কাঁপলে কী হবে! বাঘের হাঁকার শুনে, কেউ তো ভয়ে কাঁপলই না, উলটে সেই বনের পশুপক্ষী যে যেখানে ছিল সব টপাটপ বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে বাঘকে চেঁচিয়ে-এমন ভেংচি কাটতে লাগল যে, বাঘ পালাবার পথ পায় না। বাঘটা খোঁড়া ঠ্যাঙে লেংচে যতই ছোটে, বাঁদরটাও এ-গাছে ও-গাছে লাফ মেরে ততই তার পিছু পিছু চেল্লায়-

এই পালাচ্ছে ব্যাঘ্রমশাই লেংচে ভাঙা ঠ্যাং

ল্যাজ টেনে ধর, ল্যাজ টেনে ধর

চ্যাঁচায় কোলা ব্যাং!

দুয়ো দুয়ো ছ্যা ছ্যা

দিনদুপুরে ধিক্কার দেয়, রাতের হুতুমপ্যাঁচা!

বাঁদরের গঞ্জনা আর বন-ভরতি পশুপক্ষীর তাড়া খেয়ে বাঘ আর কোন মুখে সেই বনে থাকে! এই বন থেকে এক্ষুনি সে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে! তাড়ার চোটে ব্যাঘ্রমশাই সত্যিই সেই বন থেকে চিরদিনের মতো ভোঁকাট্টা!

যার এ সংসারে আপন বলতে কেউ থাকে না, তাকে তো একাই থাকতে হয়। একা থাকা কত কষ্টের বল? কারও সঙ্গে মনের কথাও বলতে পারবে না, হেসে দুটো গালগল্পও করার উপায় নেই। মুখ বুজে নিজের কাজ করে যাও! নাহয় চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ো! অবিশ্যি তাতে একটা উপকার হয়। মানুষের আয়ু বাড়ে।

তা, আমি যে মানুষটির কথা বলছি, সে এক বুড়ি মানুষ। তার আয়ু বেড়েই আছে। একা থাকে, আর, থেকে থেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আর গেলেই হয়। কবে যে সময় হবে, সে যমই জানে।'

বলতে নেই, বুড়ির নেই-নেই করে বয়স কম হল না। মুখ বুজে থাকলে মানুষের যে সত্যিই আয়ু বাড়ে, বুড়িকে দেখলে, কথাটা না মেনে উপায় নেই। মানুষটা একা থাকে বলে সারাদিন ক-টা যে কথা কয় তা গুনে বলা যায়! অবশ্য বুড়ির কথা কওয়া কি অন্যের সঙ্গে? তবে? নিজের মনের সঙ্গে মনের কথা! তা-ও আবার নিজের ওপর যখন খুব রাগ হয়, তখনই! তবে বাপু, একটা কথা মানতেই হবে, এই বয়সেও মানুষটা পারে বটে! তরতরিয়ে এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে। এটা করছে, সেটা করছে। আর হাতে সময় পেলেই কাঁথায় নকশা বুনছে। চোখের দৃষ্টি এখনও দিব্যি ঝকঝক করেছে।

ওই কাঁথা বেচে বেচেই মানুষটার পেট চলে যায়। এই যা রক্ষে।

অবশ্য রক্ষের কথা আরও আছে। বলতে নেই, মানুষটা তেমন রোগজ্বালায় ভোগেনি কখনো। তার ওপর মনটিও ভারি দয়ায় ভরা। কারও দুঃখকষ্ট দেখলে থাকতে পারে না। শীতের দিনে আঁচল গায়ে কাউকে কষ্ট পেতে দেখলে নিজের গায়ের চাদর খুলে তার গায়ে পরিয়ে দেয়। চাই কী, খিদের জ্বালায় কেউ হা-হুতাশ করলে, তাকে ডেকে আনবে নিজের ঘরে। যত্ন করে বসিয়ে পেট ভরে খাওয়ায়। তারপর ছাড়ে। এই ফাঁকে চুপিচুপি একটা কথা বলি, কাঁথা বেচে বেচে বুড়ির কিছু পয়সাও জমেছিল। বিছানার নীচে বালিশের তলায় হাত দিয়ে ঘাঁটলেই চিচিং ফাঁক। এত এত পয়সা হাতে ঠেকবে।

এই যাঃ! গোপন কথাটা মুখ ফসকে বলে ফেললাম। যাকগে, যাকগে, একবার যা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, সে তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তবে, কথাটা পাঁচকান না হলেই বাঁচোয়া। কথায় বলে-

চুপ থাকলে মুখ,

আসবে সুখ,

ঘুচবে দুখ!

সুতরাং চুপ থাকাই ভালো।

ঠিক আছে সে নাহয় চুপ থাকা গেল। কিন্তু তারপরে যা ঘটল, সেটা না বলে চুপ থাকা যায়! সেদিন হয়েছে কী, সেই বুড়ি, একটা চকমকি নকশি কাঁথা হাটে বেচে ঘরে ফিরছিল। ফেরার সময় এটা-ওটা ক-টা ফলমূল, আনাজপাতি কিনে ফুলের দোকান থেকে একটা সাদা গোলাপ ফুল সওদা করল। সাদা গোলাপ বুড়ির বড্ড ভালোবাসার ফুল। তা, কেনাকাটা করতে করতে বেলা গেল গড়িয়ে। সুতরাং বুড়ি সাধ্যমতো পা চালিয়েই হাঁটা দিল। তা, তুমি যতই পা চালিয়ে হাঁট, একটা তরতাজা জোয়ান মানুষের সঙ্গে তো আর পাল্লা দিতে পার না।

মুশকিল কী, হাটে যাবার হাঁটা পথে একটা হালকামতো বন পড়ে। সাঁজ নামবার আগেই বুড়িকে এই বনটা পেরোতেই হবে। নইলে বিপদের কথা তো বলা যায় না।

তা, আনন্দের কথা কী, দিন থাকতেই বুড়ি বনটা প্রায় পেরিয়েই এসেছিল। কিন্তু বন পেরোবার আগেই বুড়িকে আচমকা থমকে দাঁড়াতে হল। কেন? সামনে কোনো বিপদ না কি?

না, বিপদ নয়। বুড়ির নজরে পড়ল একটা পাখি। ইগল। পড়ে আছে মাটিতে। কে যেন গুলতি ছুড়ে মেরেছে তাকে। আহা! ধুকধুক করছে পাখির প্রাণ। আশ্চর্য তার পাশেই তার বাচ্চাটা কেমন চুপচাপ বসে মাকে পাহারা দিচ্ছে। বুড়ি আর থাকতে পারল না? দয়ার প্রাণ বুড়ির। ভারি কষ্ট হল দেখে। তাড়াতাড়ি আধমরা ইগল-মাকে সে কোলে তুলে নিল। বুড়ির সাধ্যে যত জোরে পা ছোটে, তত জোরে সে ছুটতে লাগল। আহারে! ইগলের ছোট্ট ছানাটাও মাটিতে পা রেখে ছুটল বুড়ির সঙ্গে।

বুড়ির এক হাতে আনাজপাতির থলি, আর-এক হাতে আহত ইগল। বুড়ি খুঁজছিল একটু জল। একবার এদিক, একবার ওদিক, নানান দিকে ছুটোছুটি করতে করতে বুড়ি একটা তালাও দেখতে পেল। আনাজের

থলিটা রেখে মা ইগলকে নিয়ে, বুড়ি জলের ধারে হেঁট হয়ে বসল। বসে, তার গালে ক-ফোটা জল দিল। তা সে জল ইগলের গলা দিয়ে গলল না। অনেকটা জল পাখির গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিল বুড়ি। কিন্তু পারল না পাখিটাকে বাঁচাতে। অগত্যা মাটি খুঁড়ে বুড়ি তার দেহটা কবর দিয়ে দিল সেই বনেই। আর সেই কবরের ওপর রেখে দিল বুড়ির সওদা করা ভালোবাসার সেই সাদা গোলাপ। তারপর বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে।

বুড়ি এখন আর এক নয়। এখন সঙ্গী তার একটি ইগলছানা। মা-হারা ইগলছানাকে বুড়ি নিজের ছেলের মতো বুকে করে বড়ো করে তুলল। এমনই করে ইগলছানাকে বড়ো করে তুলতে তুলতে দিন যায়। বুড়ির বয়স বাড়ে, পাখিরও। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে-

বুড়ির যখন দৃষ্টি-দেখন ছায়া ছায়া,

ইগল তখন দেখছে চোখে আলোর মায়া।

বুড়ির যখন কোমর ভাঙে বয়স-ভারে,

ইগল তখন শক্ত ডানায় আকাশ পারে।

বুড়ির যখন পা ঠুকঠুক চলা-ঘোরা,

ইগল তখন ডানা-টানটান হাওয়ায় ওড়া।

এমনই করে ইগলছানা হাওয়ায় ওড়ে, বুড়ির কাছে আবার ফেরে। বুড়ি যেন তার সত্যি সত্যি মা। কিংবা ইচ্ছে করলে বলতে পারো ঠাম্মা।

তা, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি তো আর বেশিদিন এদিক-ওদিক করতে পারে না। বসতে পারে না। নাইতে পারে না। এমনকী রাঁধতে পর্যন্ত পারে না। শেষমেশ বয়েসের ভারে বুড়ি শয্যা নিল। বুড়ির সেই ইগল ছেলে সে তো আর মানুষের মতো কথা বলতে পারে না। তাই সে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারল না। বলতেও পারল না। চুপচাপ সে বনে যায়। বন থেকে নিয়ে আসে নরম মিষ্টি আঙুর, নাহয় আতা, নইলে নরম নরম সফেদা। সেই ফল বুড়ি খায়, আর বলে, ‘বড়ো কষ্ট দিচ্ছি রে পাখি। আর ক-টা দিন। তারপর আর কষ্ট দেব না তোকে। তুই তখন ইচ্ছে হলেই আকাশে উড়বি। যেখানে খুশি সেখানে যাবি। সেই হবে তোর আসল জীবন।’

ইগল কথা বলতে পারে না বলেই বলতে পারল না, ‘ওগো বুড়িমা তুমিই তো আমার আসল জীবন। তুমি আমায় আদর করে, ভালোবেসে না বাঁচালে, কবেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত!’

সত্যিই বটে, ইগলের প্রাণ ওই তার বুড়িমা। আর দেখতে দেখতে সেই বুড়িমা-রই প্রাণ একদিন শেষ হয়ে গেল। বুড়ি চোখ বুজল।

যেদিন বুড়ি চোখ বুজল, সেদিন তার সেই ইগল ছেলে ডেকে এনেছিল আরও অসংখ্য ইগলকে। একটি গাছের ছায়ার নীচে তারা মাটি খুঁড়ছিল তাদের পায়ের ধারালো নখ দিয়ে। তারপর সবাই মিলে আলতো করে বুড়িকে ঠোঁটে ধরে তুলে নিয়েছিল শূন্যে। বাতাসে ভাসতে ভাসতে বুড়িকে তারা নিয়ে এসেছিল ওই খোঁড়া মাটির কবরে। তারপর তার দেহটা মাটি ছড়িয়ে ঢেকে দিয়েছিল। নিয়ে এসেছিল সেই অসংখ্য ইগল, অসংখ্য সাদা গোলাপ। সাজিয়ে দিয়েছিল সেই মাটির ওপর। আহা! কী সুন্দর দেখতে লাগছে! তারপর তারা ফিরে গিয়েছিল যে যার বাসায়।

কিন্তু ফিরে যায়নি একটি ইগল, বুড়িমায়ের সেই ছেলে। সে উড়ে আসে রোজ অজানা কোন কুলায় থেকে। নিয়ে আসে একটি করে সাদা গোলাপ। সাজিয়ে দেয় তার সেই বুড়িমায়ের কবরে। তারপর আবার উড়ে যায় আকাশে। আকাশের কোন পারে যে উড়তে উড়তে হারিয়ে যায়, আর দেখা যায় না।

রেল ইঞ্জিন ঝমাঝম

একটা ছিল রেলের ইঞ্জিন। তার নাম ঝমাঝম। রেল ইঞ্জিন ঝমাঝম এখন আর ঝিক ঝিক ছোটে না। ঝুপঝাপ হাঁটে না। ফিসফিস হাসে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে ওই ওদিকে, যেখানে ময়লা ময়লা ছাই-কয়লা পড়ে আছে। যেখানে ভাঙা গদ্দা কাঠটুকরো পড়ে আছে। যেখানে খানা-গর্তে জলে-কাদায় উপছে আছে। সেইখানেই একা একা দাঁড়িয়ে থাকে ঝমাঝম। একা নয়তো দোকা পাবে কোথায়? সেখানে যে কেউ আসে না!

না, সত্যি সত্যি কেউ আসে না। আসে না মৌমাছি উড়ে উড়ে। আসে না প্রজাপতি, ডানা মেলে। আসে না ইঞ্জিন-চালিয়ে মাথায় টুপি সেঁটে। কেনই-বা আসবে! এখন তো ঝমাঝম ফেলনা। তার কাজ নেই, তাই সাজও নেই। গায়ে পড়েছে মরচে, ঠ্যাংগুলো সব নড়ছে। কেউ ফিরেই দেখে না তার দিকে।

আগে কিন্তু সবাই দেখত ঝমাঝমকে। সবাই তার গায়ে তেল দিত। পায়ে তেল দিত। পেটে জ্বলত আগুন, দাউদাউ। তারপর ঝমাঝম ডাক ছাড়ত কু-উ-উ-উ। ছুটে চলত ঝিক ঝিক। এই দূর, আরও দূর, অনেক দূর ছুটত মানুষভরতি রেলের গাড়ি নিয়ে।

বড়ো বড়ো গাড়িতে কত কত মানুষ।

ঝমাঝম ছুটছে।

রেলগাড়ি দুলছে।

ঘুমে চোখ ঢুলছে।

ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক।

এই আসে কানপুর। ওই এল আলিগড়। তারপর দিল্লি। ছুটে চলো সিমলা।

ঃআ! কী ভালোই না লাগে ঝমাঝমের! এক-এক দেশ। এক-এক বেশ। নানান মানুষ। হরেক ভাষা। না-শেষ মাঠ ফাঁকা ফাঁকা। আকাশে রোদ ঝাঁ ঝাঁ। খাল-বিল সব শুকনো খাঁ খাঁ।

মাঠ পেরিয়ে ছুটছে গাড়ি।

রোদ মেখে গায়ে দিচ্ছে পাড়ি।

দিন গড়াবে ছুটতে ছুটতে। সাঁঝ নামবে দেখতে দেখতে। তারা ফুটফুট আকাশে। গান ঝুরঝুর বাতাসে, ঝিকিমিকি, চামচিকি, খাবে কী কী? খাব না, কিচ্ছু না। দেখো না আঁধার ঢাকে যেদিকে তাকাই। আঁধারে জ্বলছে আলো ঝমাঝমের চোখ ঠিকরে।

সামনে ওটা কী রে বাব্বা!

বন বন ঘুপ-চুপ!

বাঘ বাঘ গাঁক গাঁক!

সাপ-লতা হিসহিস!

ভূত পেরেতের ফিসফিস!

ভূত তো বড়ো বয়েই গেল।

ঝমাঝম রেল ইঞ্জিনের ভয়ও নেই, ডরও নেই। আর কু-উ-উ দিয়ে ডাকবে। বাঘ পালাবে, হালুম! ভূত বলবে, গেলুম! মজা লাগে খুব, ঝমাঝমের। ঝমাঝমের আরও মজা লাগে বর্ষা এলে। কালো মেঘ গুরগুর ঝিলিক ঝিলিক বিদ্যুৎ। ঝমাঝম বিষ্টি। কী মিষ্টি! ঝমাঝমের চাকাগুলো গান গাইবে। নাচবে লাইনের ওপর ছুটতে ছুটতে। আনন্দে।

তারপর বর্ষা শেষ হলে-

জল থই থই,

মাঠে মাঠে।

কু ঝিক ঝিক।

মাঠভরা ধান হেলন-দোলন।

কু ঝিক ঝিক!

দুধ টুপ টুপ ধানের পেট।

কু ঝিক ঝিক।

তারপর?

শরৎকালটা বেশ, না? সাদা মেঘ ঝকমক।

কাশ ফুল ফুরফুর। সোনারোদ ঝলমল! ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ছুটছে গাড়ি।

ছুটতে ছুটতে রেলের ইঞ্জিন ঝমাঝমের চোখ এদিক দেখে, ওদিক দেখে। দেখতে দেখতে মন ভরে যায়।

সামনে একটা ছোট্ট পাহাড়। তা বলে ঝমাঝমকে পাহাড় ডিঙোতে হয় না। পাহাড়ের পেটটা এফোঁড়-ওফোঁড়। তার ভেতরটা অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। চোখের আলো জ্বালিয়ে ছোটে সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। একটুও ভয় করে না ঝমাঝমের। পাহাড়ের এই অন্ধকার তাকে রোজ পেরোতে হয়। এ তার অভ্যেস। পাহাড়ের অন্ধকার ডিঙোলেই একটা ইস্টিশান। ছুটতে ছুটতে যখন ইস্টিশানটায় আসে ঝমাঝম, তখনই আকাশে ভোর নামে। ঃআ! ভোরের আলো ভারি সুন্দর। মনে হয় গায়ে মাখি। ঝমাঝম সেই আলো গায়ে মাখে। আর তার সঙ্গে গায়ে মাখে শিশির। টুপ টুপ গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে শিশির, শিশির-ফোঁটা। শিশিরে চান করে যায় ঝমাঝম রেল ইঞ্জিন। চান করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন শিশিরে চান করে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো, চুপচাপ।

সত্যি ইস্টিশানের চারিদিকে কত বড়ো বড়ো গাছ। কত পাখি। একটু পরেই লাল টুকটুক সোনা রোদ্দুর দেখা দেবে। একটু পরেই ফুলের কুঁড়ি পাপড়ি মেলে জেগে উঠবে। ফুলের গন্ধে ভরে যাবে বাতাস। মন ভরে যায় ঝমঝম ইঞ্জিনেরও। কেননা, সে যেই এসে দাঁড়াবে ইস্টিশানে, অমনি একটি পাখি উড়ে আসবে। একেবারে ঝমাঝমের মাথার ওপর। বসবে। নাচবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে সেই ছোট্ট ছেলেটি।

সেই ছোট্ট ছেলেটিকে দেখো, কত ছোটো। ঘুম ভাঙে তার কোন সকালে। ঘুম ভাঙলে সে ফুল তুলবে গাছে গাছে। মালা গাঁথবে রঙিন ফুলে। ফুলের ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে সে ছুটে আসবে ইস্টিশানে। হাঁক পাড়বে, ফুল নেবে! ফুল চাই! মালা চাই! মিষ্টি মিষ্টি ফুলের গন্ধ! ছড়িয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে ফুলের ঝুড়িও শেষ হয়ে যায়। কিন্তু একটি মালা সে রেখে দেবে। বেচবে না, কাউকে দেবেও না। সেই মালাটি হাতে নিয়ে সে ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়বে ঝমাঝমের সামনে। তারপর কাউকে কিছু না বলে তরতরিয়ে উঠে পড়বে তার গা বেয়ে। ঝমাঝমের মুখের সামনে এসে সাজিয়ে দেবে সেই মালাটি।

ভোরের আলো। ফুলের গন্ধ। গাছের সবুজ। আর চারদিকে পাহাড়ের ছবি। ঃআ! আনন্দে ডাক দেয় ঝমাঝম, কু-উ-উ।

ছেলেটা বলে, 'ইঞ্জিন তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি বড়ো করে দাও, আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।' ঝমাঝম রেল ইঞ্জিন ছেলেটার কথা হয়তো শুনতে পায়। কিংবা, কে জানে শুনতে পায় কি না, সে চলে যায় ঝিক ঝিক করতে করতে। ফিরে তাকায় না।

একদিন ঝমাঝমের বুকের ভেতরটা কেমন যেন চমকে উঠল।

কেন?

ঝমাঝম দেখে কী, তার ছুটে-চলা লাইনের ধারে ধারে বড়ো বড়ো থাম পড়ে আছে। সেগুলো সব লোহার।

তারপর আরেক দিন দেখে কী, সেই বড়ো বড়ো থামগুলো মাথা তুলে আছে লাইনের পাশে পাশে। এ-থামের মাথা জড়িয়ে ও-থামে বাঁধা হচ্ছে তার টেনে টেনে।

ঝমাঝম কিছুই বুঝতে পারল না। তবু কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না। করলেই-বা কী! তার কথা কে বুঝবে! সে শুধু ডাকতেই জানে, কু-উ-উ-উ! আর তো কিছু বলতে জানে না। কিন্তু সে দেখতে জানে। যেমন সে আমাকে দেখতে জানে, তেমনই তোমাকেও। দেখতে জানে সেই ছোট্ট ছেলেটাকে। তার হাতে ফুলের মালা।

এমনি করে দেখতে দেখতে একদিন তার চোখে পড়ল, ভাঙা ভাঙা লাইন সরানো হচ্ছে। ছোটো ছোটো ইস্টিশান বড়ো বড়ো হচ্ছে। চারদিকে কত লোক। কাজ আর কাজ। হট্টমালার দেশ যেন।

ও মা! একী! চমকে উঠল কেন ঝমাঝম হঠাৎ? সেই সরানো নতুন লাইনের ওপর দিয়ে ওটা কী ছুটে আসছে! তার মাথাটা ওপরে তারের সঙ্গে ঠেকানো। দেখতে ঠিক ঝমাঝমের মতো নয়, অথচ ছুটছে তার চেয়েও জোরে। তার গায়ে তেলও নেই, কালিও নেই। ঝকঝক করছে। নতুন রঙের গন্ধ তার গায়ে। সে ঝমাঝমের মতো কুউ-উ-উ বলে ডাকল না। সে ডাকল প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ। এম্যা! অমন সুন্দর দেখতে অথচ ডাকখানা কী বিটকেল! সে শুধু প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ করে ডাকল তাই নয়, মনে হল ঝমাঝমকে ভেংচি কেটে হুস করে বেরিয়ে গেল পাশ কাটিয়ে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল ঝমাঝমের। চেনাও নয়, জানাও নয়, অথচ কেমন অসভ্যের মতো ভেংচি কেটে পালাল! একবার ধরতে পারলে হয়। এমনি দেবে একখানি গুঁতো! এক গুঁতোতে পিলে পটকা।

কিন্তু ধরতে আর পারে না ঝমাঝম। এ যদি যায় এই লাইনে তবে ও যায় ওই মাঝরাস্তায়। এ যদি ডাকে কু-উ-উ-উ। তবে ও হাঁকে প্যা-এ্যাঁ-এ্যাঁ! এমন করে কু ডেকে সেদিনও ঝমাঝম ভোরবেলায় সেই ইস্টিশানে এসে দাঁড়াল। সেদিনও ফুলের ঝুড়ি কাঁধে সেই ছেলেটি তার কাছে এল। সেদিন সেই ছেলেটি তাকে দেখে হাসল না। তরতর করে তার সামনে উঠে ফুলের মালা সাজিয়ে দিল না। শুকনো মুখে সে বলল, 'ইঞ্জিন, ইঞ্জিন কাল থেকে তুমি আর আসবে না।'

ইঞ্জিন অবাক হল। ভাবল, কেন!

'তোমাকে আর আমি ফুলের মালা পরিয়ে দিতে পারব না।'

ইঞ্জিন আবার ভাবল, কেন? কেন?

'কাল থেকে ইস্টিশানে ইলেকটিরিক গাড়ি আসবে, তোমার হয়তো ছুটি হয়ে যাবে।'

কথাটা ইলেকট্রিক না ইলেকটিরিক সেই ঠিক কথাটাও জানে না ঝমাঝম ওই ছেলেটার মতোই। কিন্তু কেমন যেন একটা অজানা ভয়ে সে শিউরে উঠল। তারপর হঠাৎই আবার ডাক ছেড়ে ছুটল সামনে। ওই লাইনের বাঁক ধরে। না, আজ আর ছুটতে মন চায় না ঝমাঝমের। বার বার মনটা যেন আনমনা হয়ে যায়। তবে কি সত্যিই আজ তার শেষ দিন। তবে

কি আর আসবে না সেই শীতের রাতগুলো, থমাথম! আসবে না সেই বর্ষার দিনগুলো রিমঝিম! আসবে না সেই শরতের কাশ ফুল, ঝুরঝুর!

প্যাঁ-প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ।

চমকে উঠল ঝমাঝম রেলের ইঞ্জিন। কে আসছে ওই সামনে দিয়ে! মনে হচ্ছে, সেই গাড়িটা। হ্যাঁ, ওই তো তার মাথাটা! টিকিটা আটকে আছে মাথার ওপর তারের সঙ্গে। ঠিক ঠিক। রাগে গরগর করে উঠল ঝমাঝম। আজ ওর প্যাঁ-প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ করা বার করে দেবে। আর একটু আসুক। এই লাইন থেকে লাফিয়ে ওর ঘাড়ে পড়বে ঝমাঝম। এমন রামধাক্কা দেবে যে, বাছাধনকে আর টুঁ করতে হবে না।

ঠিক বটে, টুঁ করল না। কিন্তু ঝমাঝমের কাছাকাছি এসে এমন প্যাঁ-প্যাঁ এ্যাঁ করে খেঁকিয়ে উঠল যে, ঝমাঝমের পা পিছলে সড়াৎ-ৎ-ৎ। লাইন থেকে বেলাইন হয়ে মারল গোত্তা। কী ভয়ংকর শব্দ। ঝমাঝম রেল ইঞ্জিনের টানা মস্ত গাড়িটা ঝাঁকুনি খেল। তারপর ঝন ঝন করতে করতে এ-পাশে কেতরে, ও-পাশে ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়িসুদ্ধ লোক চেঁচিয়ে-মেচিয়ে মায়াকান্না জুড়ে দিল।

খুব রক্ষে বলতে হয়, তেমন কারও লাগেনি। ঝমাঝম নিজে হুমড়ি খেল বটে, তবে সামলে নিয়েছে।

কিন্তু পায়ের চাকা-টাকা খুলে ভেঙে ছত্রাকার। যার জন্য এই সর্বনাশ, সেই প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ ততক্ষণে পগারপার।

ব্যাস। সেই দিনই শেষ হয়ে গেল ঝমাঝমের কাল! আসলে বুড়ো হয়ে গেলে যা হয়! একে বুড়ো, তায় আবার পা ভাঙা। এখন আর কোনো কাজে লাগবে না সে মানুষের। তার গায়ের লোহাগুলো সের দরে বেচে দিলেই পারে।

ঝমাঝমকে টেনে আনা হল এইখানে। এই যেখানে সে এখন দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকে ঝমাঝম আর দেখে, আরও কত নতুন নতুন প্যাঁ-প্যাঁ গাড়ি তার চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে আর আসছে।

নাচতে নাচতে দেমাকে বুক ফুলিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে।

সত্যিই রেলের কর্তারা আর সারায়নি ঝমাঝমের চাকাগুলো। নিয়েও যায়নি তাকে অন্য কোথাও। এই খানেই পড়ে রইল সে। বুড়ো, ভাঙা রেলের ইঞ্জিন। বুড়ো আর কোন কাজে লাগবে! হায় রে! কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই বুড়ো!

সুহানি।

কে রাখল ছোট্ট মেয়েটার এমন একটা মিষ্টি নাম! তুমি ডাকো না এখনই তার নাম ধরে, একটু জোরে-'সু-হা-নি'! মনে হবে বাতাসে দোলন দিয়ে শব্দটা ভেসে গেল তার কানে। সে সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

নামের মতো মিষ্টি তার গলার স্বরটিও। মুখের আদলটিও দেখো কী সুন্দর! একবার দেখলে অনেকক্ষণ দেখতে হবে তোমায়! এমন যার গলার স্বর, এমন যার রূপের বাহার তাকেই তো বলতে ইচ্ছে করে রাজকন্যা। আর হ্যাঁ, সত্যিই একদিন সবাই তাকে রাজকন্যা বলেই ডেকেছিল। হ্যাঁ, ঠিক তাই। মাত্র এক দিনের জন্যে।

তারপর?

তারপর সে ভারি মন কেমন করা গল্প।

বলতে নেই, সুহানির বয়স এমন কিছু বেশি নয়। চার। খুব বেশি হলে পাঁচ। তা-ও হবে না। তার বাবা মাঠে মাঠে চাষ করেন। বাদলের বৃষ্টিতে চাষের খেত উপুড়-ঝুপুড় হলে, হাতের মুঠিতে সবুজ ফসল আকাশে তুলে তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ফেরেন। আর, বাদলের বদলে আকাশে রোদের দাপট দেখা দিলে মাঠ ফাটে। শূন্য হাতে 'হায় হায়' করে তিনি ঘরে ফেরেন। সুহানির মা তখন আকাশকে কাকুতিমিনতি করে বলেন, 'ও আকাশ, মেঘ তো তোমারই মেয়ে! তোমার মেয়ে যদি দয়া না করে, তবে আমার মেয়ে যে বাঁচে না। মেয়েকে নিয়ে যে আমাদের অনেক স্বপ্ন। অনেক সাধ। তার মুখে যদি দুটো অন্ন তুলে দিতে না পারি, তবে যে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আমাদের স্বপ্ন! তুমি, তোমার মেয়ে মেঘকে বলো না, দু-ফোঁটা বৃষ্টি ছড়িয়ে দিতে!'

কী জানে আকাশ মায়ের কথা শোনে কি না!

কিন্তু, মেঘ কী করল, সে নিয়ে বাবা ব্যস্ত হন না। তিনি মেয়েকে ইশকুলে পাঠান তার মায়ের সঙ্গে। সেখানে সে খেলা করে। গান গায়। ছবি আঁকে। ছবি দেখে বই পড়ে। পড়া মানে ছবির গল্প শোনা। সে এখনও জানে না, কেমন করে অ্যাত্তোবড়ো পৃথিবীটা গড়ে উঠেছে। সে এখনও

জানে না, মানুষ এল কোথা থেকে? কেমন করে তারা কথা বলতে শিখল? কেমন করে ঘর বাঁধল? তার এখনও জানা হয়নি, ওই যে সেফটিপিনটা তার জামায় আটকানো ওইটা তৈরি করার বুদ্ধি কার মাথায় প্রথম এল? কিংবা কে তৈরি করল টিভি? এমনকী সে জানে না, যে-কাকুটা কানে টেলিফোন নিয়ে রাস্তাঘাটে হেঁটে-চলে কথা বলছে, ওইটাই-বা কে বানাল? এমনই হাজারটা জানার কথা তার এখনও জানা বাকি। সুহানি এখন ঠুকুসঠুকুস করে হাঁটে যে-কচ্ছপ, আর দুরন্ত দৌড়োতে পারে যে খরগোশ, তাদের সেই হারজিতের গল্পটা শুনবে। আর ইশকুলের দিদির কাছে শিখবে-

অন্যকে যে তুচ্ছ ভেবে পুচ্ছ নাচায় আহ্লাদে,

শেষাশেষি সেই তো পড়ে তাচ্ছিল্যের জাল-ফাঁদে।

নয়তো, শুনবে সেই দুই বন্ধুর গল্প। জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে দুই বন্ধু যখন দেখতে পেল একটা ভাল্লুক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন কী করল তারা? শুনবে সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া ঘটনা!

সুহানি খুব সকালে উঠবে। দুধ-রুটি খেয়ে মায়ের হাত ধরে ইশকুলে যাবে। খেতের ধারে অনেক খেজুর গাছ। খেজুর গাছের আড়ালে তাদের মাটির ঘর। ঘর থেকে ক-পা এগোলেই পাকা রাস্তা। এই পাকা রাস্তাই এককালে কাঁচা ছিল। বর্ষাকালে কী কাদাই না জমত। একহাঁটু কাদা টপকাতে হত। এখন কী-বা বর্ষা, কী-বা গ্রীষ্ম একফোঁটা কাদার ধ্যাবড়া, কি ধুলোর জ্যাবড়া নজরে পড়বে না। পরিষ্কার ঝরঝরে। তবে কী আর ঝড়ঝাপটা হলে গাছের পাতা ঝরবে না! উড়ে পড়বে না পথের ওপর! তখন কী সুন্দর দেখতে লাগে। এক-একদিন পাতাগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, অদ্ভুত! কোনোদিন মনে হবে রাস্তার ওপর যেন একটা পদ্ম ফুল পড়ে আছে! আবার কোনোদিন মনে হবে কে যেন একটা মাছ এঁকে রেখেছে রাস্তার গায়ে।

সুহানিদের ইশকুলে এখন পড়ার শেষে, দুপুরে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। পেট ভরে খাও, তারপর বাড়ি যাও! তবে এটা ঠিক, ইশকুলে পড়া যেমন শেখানো হয়, তেমনই শেখানো হয় নাচ-গান আর নাটকও। সুহানির নাটক করতে খুব ভালো লাগে। প্রত্যেক বছর, একদিন খুব ধুমধাম করে ইশকুলে নাটক হয়। কত বড়ো বড়ো মানুষ দেখতে আসেন। একবার একটা রাজা-রানির নাটকে সুহানি রাজকন্যা সেজেছিল। আহ, তোমাকে বলব কী, মেয়েটাকে মানিয়েছিল বটে! যেমন রূপের বাহার,

তেমনই ঝলমলে পোশাক। নাটক করতে করতে সুহানি যখন আধো-আধো স্বরে রাজাকে বলছি, 'বাবা, বাবা চাঁদের আলো কেন দিনের

আলোয় হারিয়ে যায়?' তখনই মনে হচ্ছিল, মেয়েটাকে এখনই কোলে তুলে

আদর করি!

নাটক শেষ হলে সবাই একেবারে হামলে পড়ল মেয়েটাকে দেখার জন্যে। এ হাতে হাত রাখে, ও চিবুক ছোঁয়! কেউ-বা আদর করে কাছে টেনে নেয়। সে এক হইহই ব্যাপার!

তা সে যাই হোক, যেমন সব কিছুর শুরু আছে, তেমন শেষও আছে। একে একে অত মানুষ সবাই ঘরে ফিরে গেলেন। সুহানির সঙ্গে যেসব খুদে বন্ধুরা নাটক করল, তারাও নাটকের পোশাক পালটে, ফিরে গেল যে-যার ঘরে। কিন্তু এক জন ফিরল না। সে-জন সুহানি। সে রাজকন্যার পোশাক খুলল না। প্রথমটা তেমন কেউ বুঝতে পারেনি। কিন্তু অনেক সাধাসাধির পরও যখন সে খুলতে রাজি হল না, তখনই বাধল বিপদ!

মা বললেন, 'এটা তোমার পোশাক নয় সুহানি। তোমার পোশাক এইটা,' বলে মা সুহানির ফুলকাটা ফ্রকটা দেখালেন। এটা পরেই সে আজ ইশকুলে এসেছে।

সেই ফ্রকটার দিকে নিমেষ তাকিয়ে সুহানি চোখ সরিয়ে নিল। রাজকন্যার পোশাকটা আগলে রাখল নিজের গায়ে। পোশাকটার কী জেল্লা!

মা বললেন, 'ছিঃ, সুহানি অমন করে না! লোকে নিন্দে করবে! এসো, আমি খুলে দিই!' জামাটা খোলার জন্যে মা সুহানিকে কাছে টেনে নিলেন।

সুহানি মায়ের হাত ছাড়িয়ে সরে গেল। জোর গলায় বলল, 'না, খুলব না। আমি তো রাজকন্যা। এতক্ষণ সবাই আমায় রাজকন্যা, রাজকন্যা বলে ডাকছিল! এখন পোশাক খুলতে বলছ কেন?'

মা বললেন, 'রাজকন্যার পোশাক পরে তুমি তো নাটকে রাজকন্যা সেজেছিলে! তুমি তো আসল রাজকন্যা নও। আমি কি তোমার রানিমা?'

ছোট্ট মেয়েটা মায়ের কথা শুনে থমকে গেল!

মা বললেন, 'আয় খুলে দিই।'

ছোট্ট মেয়েটা কী যেন ভাবতে ভাবতে আলতো পায়ে মায়ের কাছে এগিয়ে গেল। মা খুলে দিলেন তার গা থেকে রাজকন্যার পোশাক। মেয়েটা

আর ওজর-আপত্তি করল না। কিন্তু কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। আনমনে মায়ের হাত ধরে সে ঘরে ফিরে গেল।

সেদিন সেই থেকে সারাক্ষণ কারও সঙ্গে কথা বলেনি সুহানি। কীসের ভাবনায় যেন আকাশের কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে তার মুখখানি! সে কি কথা বলতে ভুলে গেল! নইলে চুপ করে আছে কেন অমন বোবার মতো!

না, কথা বলতে ভুলে যায়নি সুহানি! সে হঠাৎ কথা বলল, রাত্রে, মায়ের পাশে শুয়ে। জিজ্ঞেস করল, 'মা, তুমি তখন বললে আমি আসল রাজকন্যা নই। তাহলে আসল রাজকন্যা কারা? কাদের বলে?'

মা চমকালেন। মেয়ের মুখে এই অবাক-করা প্রশ্ন শুনে। তিনি কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না। বলে ফেললেন, 'আসল রাজকন্যার বাবা হলেন রাজা। আর মা হলেন রানি। তাঁরা থাকেন তাঁদের মেয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে।'

'তাহলে বাবাকে রাজা হতে বলো না মা! বাবা রাজা হলেই তুমি হবে রানি। তখন আমরা সবাই একসঙ্গে রাজপ্রাসাদে থাকব।' মেয়ে সরল মুখে এমন অসম্ভব কথাটা কেমন সহজে বলে ফেলল।

মা হয়তো হাসলেন মুখ টিপে। অন্ধকারে দেখা গেল না মায়ের সে-মুখ। কিন্তু শোনা গেল তাঁর কথা। তিনি উত্তর দিলেন, 'না রে মেয়ে, ইচ্ছে করলেই কি রাজা হওয়া যায়? না, হওয়া যায় রানি?'

সুহানি তেমনই সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন হওয়া যায় না, মা?'

তার উত্তর মা দিতে পারলেন না। আদর করে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন মেয়েকে। তারপর বললেন, 'তুমি তো এখন ছোট্ট আছ, বড়ো হও, তখন বুঝতে পারবে। লক্ষ্মী মেয়ে! এখন ঘুমিয়ে পড়ো!'

হ্যাঁ, শেষমেশ ঘুমিয়েই পড়েছিল সুহানি। ঘুমিয়ে পড়েছিল মায়ের হাতটি আঁকড়ে ধরে।

অমন যে হাসিখুশি মেয়ে, পরের দিন সকাল থেকে সেই মেয়ের হাসিও ফুরোল, খুশিও হারাল। কেমন যেন অন্যমনা হয়ে গেল মেয়েটা।

মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল রে সুহানি? শরীর খারাপ লাগছে?' বলে, মা সুহানির কপালে হাত রাখলেন। ভাবলেন, জ্বর হল না কি মেয়েটার!

না, জ্বর তো গায়ে নেই!

বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল রে সুহা? মুখ কেন ভার?'

সুহানি উত্তর দেয়, 'ভালো লাগছে না।'

ভালো লাগবে কী করে? এখন তার মন শুধু জানতে চায় কেন বাবা রাজা নয়! মা কেন রানি নয়! আর সে-ই-বা কেন রাজকন্যা নয়! মা বলেছেন, এসব কথা বড়ো না হলে বুঝবে না সে। কিন্তু এখনই যে এসব কথা জানার জন্যে তার মন ছটফট করছে। বড়ো সে কবে হবে? আর কত বড়ো হলেই-বা সে বুঝবে, এটাও তো সে জানে না।

এমনই নানান কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে মেয়েটা একা, একফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, কেউ খেয়াল করেনি। বেরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোথা দিয়ে কোনদিকে যাবে কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না। তবু সে দাঁড়াল না। যেদিকে দু-চোখ যায় সেই দিকেই সে গুটিগুটি হাঁটল।

খানিক যেতেই, ইশকুলের দিদি তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছেন। কাল ধুমধাম করে ইশকুলে নাটক হয়েছে, আজকে তাই ছুটি। তিনিও যেন অন্য কী কাজে কোথাও যাচ্ছিলেন। এই দিদিই তাদের গল্প বলে পড়া শেখান। তিনি সুহানিকে দেখতে পেয়ে ডাক দিয়েছেন, 'সু-হা-নি!'

সুহানি শুনতে পেয়েছে। চমকে তাকিয়েছে। দেখতেও পেয়েছে দিদিকে। দিদির দিকে এগিয়ে গেছে ক-পা। তার আগেই দ্রুত পা ফেলে দিদি এগিয়ে এসেছেন সুহানির কাছে। খুশিমুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে দিদির। সুহানির চিবুক ছুঁয়ে আদর করলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'একা একা কোথায় যাচ্ছিস?'

সুহানির মুখে হাসি এল না। মুখ শুকনো করে সে উত্তর দিল, 'কোথাও না।'

দিদি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল তুই অমন সুন্দর নাটক করলি, সবাই তোকে কত আদর করল, আর আজ তোর মুখ অমন শুকনো কেন?'

সুহানি অন্য কোনো কথা না বলে সোজাসাপটা উত্তর দিল, 'আমার রাজকন্যার পোশাক তো তোমরা খুলে নিলে! কেন খুলে নিলে, তা আমি জানি।' বলে চুপ করে গেল সুহানি।

অবাক হলেন দিদি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জানিস?'

সুহানি তেমনই চটপট জবাব দিল, 'আমি যে আসল রাজকন্যা নই, তা-ই! আমার বাবাও রাজা নয়, মা-ও রানি নয়। আমাদের রাজপ্রাসাদও নেই।'

তারপর ইশকুলের দিদিকে আবদার করে বলল, 'আমি রাজকন্যা হতে চাই, আসল রাজকন্যা। আমি অমন ঝলমলে পোশাক পরব। মুক্তোমালা গলায় দেব। মাথায় দেব মুকুট। তুমি বলো না দিদি আসল রাজকন্যা কেমন করে হওয়া যায়!'

এ প্রশ্নের উত্তর দিদির জানা নেই। কী উত্তর দেবেন তিনি ভেবে পান না। শুধু বললেন সেই সহজ কথাটা, 'অনেক লেখাপড়া করলে একদিন হয়তো তুই-ও আসল রাজকন্যা হয়ে যেতে পারিস।'

দিদির এই কথা শুনে সুহানিও একটা খুব শক্ত প্রশ্ন করে বসল, 'লেখাপড়া শিখলেই বুঝি রাজকন্যা হওয়া যায়? তবে তুমি কেন রাজকন্যা হওনি? তুমি তো অত লেখাপড়া শিখেছ?'

উত্তর দিতে পারেননি দিদি। আকাশের দিকে চোখ তুলে, কথা ঘুরিয়ে বলেছিলেন, 'দেখছিস কীরকম ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। এই রোদে বেশি ঘুরঘুর করিস না। অসুখ করবে। কাল ইশকুল খুললে তোকে একটা আসল রাজকন্যার গল্প বলব। আজ ঘরে যা!'

দিদি চলে গেলেন, কিন্তু সুহানি ঘরে গেল না। আপনমনে হাঁটতে লাগল। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করলেও সে রোদ যেন তার গায়ে লাগে না। এখন তার শুধুই মনে হচ্ছে, সে কাকে জিজ্ঞেস করবে, কে বলতে পারবে আসল রাজকন্যা সে কেমন করে হবে!

আ রে! আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে আর ভাবতে ভাবতে এ কোন পথে চলে এসেছে সুহানি? বড়ো ইশকুলের হেডস্যার হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন সুহানিকে। চিনতেও পেরেছেন। অবশ্য সুহানিকে তাঁর চেনার কথা ছিল না। কিন্তু কাল তিনিও গিয়েছিলেন সুহানিদের ইশকুলে নাটক দেখতে। তাঁরও খুউব ভালো লেগেছে সুহানির রাজকন্যার অভিনয়। সুহানিকে দেখেই হেডস্যারের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি ডাক দিলেন সুহানিকে। সুহানি দাঁড়াল। হেডস্যার সুহানিকে কাছে টেনে আদর করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই রোদে একা একা কোথায় যাচ্ছ তুমি? কাল ইশকুলে যে নাটকটা হল, তাতে তুমি রাজকন্যা সেজেছিলে না? কী সুন্দর করলে তুমি! তোমাকে মনে হচ্ছিল, তুমি যেন সত্যি রাজকন্যা!'

স্যারের কথা শুনে সুহানির ভারমুখ যেন আরও ভার হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, 'আমায় যদি সত্যিই রাজকন্যার মতো মনে হচ্ছিল, তবে ওরা আমার রাজকন্যার পোশাকটা খুলে নিল কেন?'

স্যার হেসে ফেললেন। বললেন, 'ওটা তো তোমার পোশাক নয়। যারা রাজকন্যা সাজায় পোশাকটা তাদের। অনেক দাম। যেখানেই রাজা-রানির নাটক হয়, সেখানেই ওই পোশাক পরিয়ে তারা রাজকন্যা সাজায়।'

সুহানি জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ওই একটা পোশাক পরেই সবাই রাজকন্যা সেজে নাটক করে? তাহলে আসল রাজকন্যার পোশাক কোথায় পাওয়া যায়?'

স্যার হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'আসল রাজকন্যার গায়ে।'

সুহানি আবার তখনই জিজ্ঞেস করল, 'আমি কেন আসল রাজকন্যা হতে পারি না? আবার বাবা কেন রাজা হতে পারে না? মা রানি? আমাদের কেন রাজপ্রাসাদ নেই?'

স্যারের বুঝতে দেরি হল না। এই ছোট্ট মেয়েটার মনের কথা! বুঝতে পারলেন তার দুঃখের কথা! কী উত্তর দেবেন তিনি? এর উত্তর তাঁর জানা নেই। তাই তিনিও কথা ঘোরালেন। জানতে চাইলেন, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

সুহানি উত্তর দিল, 'আমি রাজপ্রাসাদ খুঁজছি!'

হেডস্যার থমকে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, 'মেয়েটা নিজে যেমন বিপদে পড়েছে, তেমনই তাঁকেও বিপদে ফেলেছে! এমনই যখন অবস্থা, কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, তখনই যেন তিনি হাতে চাঁদ পেয়ে গেলেন। তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার মতো পেয়ে গেলেন তিনি তাঁর এক পুরোনো ছাত্রকে। পুরোনো মানে, বয়স হিসেব করলে ছাত্রটি তিরিশ তো হবেই। ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্যারকে দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। প্রণাম করলেন। বাড়ির খোঁজখবর নিলেন। আর, এই অসময়ে নেহাতই একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কে?'

স্যার উত্তর দিলেন, 'সুহানি। আমার নিজের অবশ্য কেউ নয়। তবে খুব গুণের মেয়ে। কাল সুহানিদের ইশকুলে একটা নাটক হয়েছিল। আমি দেখতে গিয়েছিলুম। সুহানি রাজকন্যা সেজেছিল। খুব সুন্দর অভিনয় করল। আজ হঠাৎ এই রাস্তায় দেখা হয়ে গেল! একা একা ঘুরছে।'

ছাত্রটি বললেন, 'নেহাতই ছোট্ট। মা-বাবা দেখেন না?'

'নিশ্চয়ই দেখেন। হয়তো তাঁদের ফাঁকি দিয়ে একাই বেরিয়ে পড়েছে।' উত্তর দিলেন স্যার।

ছাত্রটি জবাব দিলেন, 'দেখুন তাঁরা হয়তো মেয়েকে হয়রান হয়ে খুঁজছেন।'

স্যার বললেন, 'ঠিক বলেছ, তাঁরা যেমন মেয়েকে হয়রান হয়ে খুঁজছেন, মেয়েও তেমনই হয়রান হয়ে রাজপ্রাসাদ খুঁজছে।'

ছাত্রটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে?'

হেডস্যার তখন সুহানির মনের কথা ছাত্রকে শোনালেন।

স্যারের সব কথা শুনে ছাত্রটি মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন এই কথা! এ আর এমন কী! আমি নিজে সুহানিকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাব। সুহানিকে আসল রাজকন্যা করার ভার আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। দেখুন কী করি।' বলতে বলতে ছাত্রটি চট করে স্যারকে চোখ টিপলেন। তারপর বললেন, 'স্যার, এখন আপনি বাড়ি যান। সুহানি এখন আমার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে যাবে।'

'সত্যি-ই-ই-ই?' সুহানির মুখে হাসি উছলে উঠল।

ছাত্রটি বললেন, 'সত্যি কি না খানিক পরেই দেখতে পাবে। চলো এখন আমরা রাজপ্রাসাদে যাই! স্যার আপনাকে আর কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আপনি বাড়ি যান। পারেন তো সুহানির খবর ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।' বলে ছাত্রটি স্যারকে আর একবার চোখ টিপলেন সুহানিকে লুকিয়ে।

স্যার সুহানির চিবুক ছুঁয়ে বললেন, 'তবে আমি আসি?'

সুহানি ঘাড় নেড়ে হাসল। স্যার চলে গেলেন।

স্যার চলে গেলেন এক রাস্তায়, আর তাঁর পুরোনো ছাত্রের সঙ্গে সুহানি চলে গেল আর এক রাস্তায়।

চলতে চলতে সুহানি হঠাৎ এবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে এখন কোথায় যাব?'

'প্রথমে যাব আমরা বনে।' ছাত্রটি উত্তর দিলেন।

'বনে কেন?' জিজ্ঞেস করল সুহানি।

'বনের ধারেই সমুদ্দুর। জাহাজে চেপে আমাদের সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে হবে। যেতে হবে সমুদ্দুরের ওপারে।'

'সমুদ্দুরের ওপারে রাজপ্রাসাদ আছে?' জিজ্ঞেস করল সুহানি।

‘না, পাহাড় আছে। সেই পাহাড় ডিঙোতে হবে।’

‘কেন?’ আবার প্রশ্ন সুহানির।

‘পাহাড় ডিঙোলে তবেই তো পড়বে বরফের দেশ।’

‘বরফ পেরিয়ে আমরা রাজপ্রাসাদে যাব?’

‘না, আমাদের আরও যেতে হবে।’

‘কোথায়?’

‘মরুর দেশ।’

‘সে তো বালির রাজ্য।’

‘সেই বালির রাজ্য পেরোলেই রাজপ্রাসাদ।’

‘শুনেছি মরুভূমিতে হঠাৎ হঠাৎ ঝড় ওঠে।’ যেন ভয় পেল সুহানি।

‘শুধু ঝড় ওঠে না, ভয়ংকর ঝড় ওঠে, বালির ঝড়।’ ছাত্রটি যেন সুহানির ভয়ের ওপর আর একটা ভয়ের বোঝা চাপিয়ে তাকে শিউরে দিলেন। তারপর আবার বললেন, ‘কতক্ষণই-বা সে ঝড় থাকে। কিন্তু এক নিমেষের ঝড়েই এমন বালির ঝাপটা মানুষকে আঘাত করে যে, তাতে অনেকের প্রাণও বেরিয়ে যায়। ভাগ্যের জোরে যারা বেঁচে যায়, তারা বালির ওপর গড়াগড়ি খেতে খেতে অতি কষ্টে জলের জন্যে চিঁ চিঁ করে চ্যাঁচায়! তখন কে তাদের জল দেবে! তা ছাড়া বালির রাজ্যে বললেই তো আর জল পাওয়া যায় না। সুতরাং গলা শুকোবে। জিব শুকিয়ে সাদা হয়ে যাবে। নীল হয়ে যাবে ঠোঁট। মনে হবে, যেন রোদের আগুনে ঝলসে তুমি ছাই হয়ে যাচ্ছ। নয়তো বালির পাহাড়ে চাপা পড়ে তোমার জীবনটাই শেষ হয়ে যাচ্ছে!’

‘তাহলে?’ ভীষণ ভয় পেয়ে সুহানি জিজ্ঞেস করল।

‘তাহলে কিছু করার নেই। আমাদের যখন রাজপ্রাসাদে যেতেই হবে, তখন তো আর থামলে চলবে না। চলো এগিয়ে চলি।’ উত্তর দিলেন ছাত্রটি।

তখন সুহানি যে সত্যিই মন ঠিক করতে পারছে না সে তো তার কথা শুনে বোঝাই গেল। সে বলল, ‘আচ্ছা, আমরা নাহয় এখন বিনা বাধায় রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেলাম, মরুভূমিতে ঝড়ও উঠল না, কিন্তু আমার মা

আর বাবাকে তো আসতে হবে রাজপ্রাসাদে। তারা সিংহাসনে বসে রাজা-রানি না হলে আমি কেমন করে রাজকন্যা হব?'

ছাত্রটি উত্তর দিলেন, 'সে তো ঠিক কথাই।'

'তাহলে, তারা যখন মরুভূমি পেরিয়ে রাজপ্রাসাদে আসবে, তখন যদি ঝড় ওঠে?' জিজ্ঞেস করল সুহানি।

ছাত্রটি বলল, 'উঠতেই পারে।'

'তখন কী হবে?' জিজ্ঞেস করতে গলা কাঁপল সুহানির।

'তখন কী হবে এখন তা বলা না গেলেও, একটা ভয়ানক বিপদ যে ঘটতেই পারে এটা বলা যায়!'

সুহানি ছাত্রটির একটি হাত চেপে ধরল। বলল, 'চলো!'

'কোথায়?'

'আমি বাড়ি যাব।'

'কেন? রাজপ্রাসাদে যাবে না?'

সুহানি আবার একই কথা বলল, গলায় জোর দিয়ে, 'আমি বাড়ি যাব।'

ছাত্রটি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি রাজকন্যা হবে না?'

'না-আ-আ-আ,' যেন আর্তনাদ করে উঠল সুহানি।

মৃদু হাসলেন ছাত্রটি। বললেন, 'তাহলে তো তোমার বাবাও রাজা হতে পারবেন না, মা-ও হবেন না রানি!'

'দরকার নেই তার,' যেন ঝাঁঝিয়ে উঠল সুহানি। বলল, 'যে রাজপ্রাসাদে যেতে মরু পেরোতে হয়, ঝড়ের ঝাপটায় আঘাত পেতে হয়, বালির নীচে হারিয়ে যায় মানুষ চিরদিনের মতো, সেই ভয়ংকর মরু পেরিয়ে আমার মা-বাবা যাবে না সেই রাজপ্রাসাদে কোনোদিন। বালির নীচে তারা হারিয়ে গেলে আমাকে ভালোবাসবে কে? কাকে আমি মা বলে ডাকব? বাবা? আমারও যে সব হারিয়ে যাবে!' বলেই আচমকা সেখান থেকে সুহানি ছুট দিল। ডাক দিল, 'মা-আ-আ! বাবা-আ-আ!'

আকাশের রোদ তখন আরও ঝলমলিয়ে উঠেছে। ঝলমলিয়ে উঠেছে হেডস্যারের বুদ্ধিমান ছাত্রটি মুখখানিও। তিনি একদৃষ্টে দেখছেন, সুহানি ছুটছে! আর ভাবছেন সুহানি হয়তো এখনই ছুটতে ছুটতে পৌঁছে যাবে

ঘরে। ঝাঁপিয়ে পড়বে মায়ের কোলে! তারপর হাসতে হাসতে মায়ের কপালে চুমো দেবে। তখন না জানি কী সুন্দর দেখতে লাগবে সেই দৃশ্যটা। আহা!

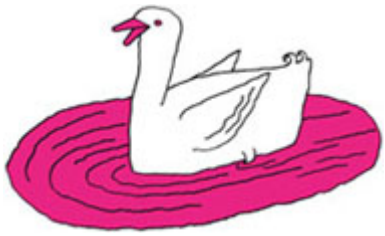

ভোরের আকাশ। পাহাড়। সবুজ বন। পাখির কলতান। ঝরনা। পাহাড়ি পথ। পাহাড়ি মানুষের আনাগোনা। পাহাড়তলিতে এক্কাগাড়ি। একটি-দু-টি। বন-সবুজের আড়ালে ধ্বংসস্তূপ। একটি ভাঙা মূর্তি। একটি ছোট্ট ছেলে ঘুমোচ্ছে ভাঙা মূর্তির পায়ের কাছে। তার পরনে পাতলুন। রঙিন জামা। পাহাড়ি ধুলোয় পাঁশুটে। ভাঙা মূর্তির ভাঙা হাতে ঝুলছে ছেলেটার টুপি। একপাশে জুতো, মাথার কাছে একটি ফুলের ডালি।

আচমকা একঝলক ভোরের হাওয়া বয়ে যায়। ঘুম ভেঙে যায় ছেলেটার। ধড়ফড় করে উঠে পড়ে। চোখ কচলায়, আকাশের দিকে তাকায়, নিজের মনে বলে, 'এ বাবা, ভোর হয়ে গেছে! একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

উঠে দাঁড়াল, ভাঙা মূর্তিটার মুখের দিকে তাকাল! রাগের ভান করল। বলল, 'তুমি একটি অকম্মা। কোথায় ডেকে তুলে দেবে তা নয়, চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে! একদম বোবা! একটা হাত নেই, চোখদু-টিও তথৈবচ! আমি বলে তাই তোমায় ভালোবাসি। কানাখোঁড়াকে কে ভালোবাসে শুনি?'

হঠাৎ হেসে উঠল ছেলেটা। হাসতে হাসতে আদর করে জড়িয়ে ধরল মূর্তিটাকে। জিজ্ঞেস করল, 'রাগ করলে? না, না রাগ কোরো না! আমার কি তোমায় অমন কথা বলা উচিত! তুমি না থাকলে আমি কার কাছে থাকতাম? কাকে বলতুম, কবে কত টাকা পেয়েছি ফুল বেচে? আর জমানো টাকাগুলো রাখতুমই-বা কোথায়? সে টাকা তোমার ওই গায়ের গর্তে পাথর চাপা দিয়ে লুকিয়ে না রাখলে কবেই হাপিস হয়ে যেত।' বলতে বলতে চাপা পাথরটা মূর্তির গায়ের গর্তটা থেকে সরাল। গর্তে হাত ঢোকাল। তার ভেতর থেকে একগোছা টাকা বার করে আনল। চাপা গলায় বলে উঠল, 'উফ! কত জমেছে রে?' নিজেই নিজে অবাক! আবার চটপট রেখে দিল গর্তে, পাথর চাপা দিল।

ছেলেটা ধড়ফড় করে পায়ে জুতো পরল। মূর্তির হাতে ঝোলানো টুপিটা মাথায় দিল। ফুলের ডালি হাতে নিল। ঝরনার ধারে ছুটল। ঝরনার জলে মুখ-চোখ ধুল। ঠান্ডায় হি হি কাঁপছে! ছুটল পাহাড়ের ওপরে।

বন, বনে বনে ফুল তুলছে ছেলেটা। ডালিতে ফুল রাখছে। হঠাৎ শুনতে পেল, পাহাড়ের গায়ে বসানো রেললাইনে ট্রেন আসছে, -কু-উ-উ!

ছেলেটা চনমন করে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল, 'এই রে গাড়ি এসে গেল।'

দেখা যাচ্ছে, রেলগাড়ি ছুটছে পাহাড়ের গায়ে এঁকেবেঁকে লাইন ধরে।

ছেলেটাও ছুটছে গাড়ির পেছনে পেছনে।

এসে গেল ইস্টিশান। পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো সুন্দর। কত লোক, কত মোটঘাট।

গাড়ি থামল। ছেলেটাও ছুটতে ছুটতে থামল। লোক নামছে, লোক উঠছে। হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে গেল। তারই সঙ্গে ছেলেটাও হাঁক পাড়ল, 'ফুল নেবে ফুল, রঙিন ফুল।' এধার-ওধার ভিড় ঠেলছে। ফুল বেচছে।

কেউ কিনছে, কেউ আড়চোখে দেখছে। কেউ দেখছেই না তার দিকে। সবাই ব্যস্ত। কুলির মাথায় মাল উঠছে। এক্কাওলা যাত্রী ডাকছে। দেখা যাচ্ছে একটি ছোট্ট মেয়ে ট্রেন থেকে নেমেছে ভিড় ঠেলে বাবা-মা-র সঙ্গে। মেয়েটির পরনে ফ্রক। গায়ে কার্ডিগান, মাথায় রিবন। পায়ে মোজা, জুতো। মায়ের পরনে শাড়ি। গায়ে বাবার কোট-প্যান্ট-শু। মেয়েটি দেখতে পেল ছেলেটাকে। তার চেয়ে একটু বড়ো। ছেলেটাও দেখছে তাকে। ছেলেটা এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। জিজ্ঞেস করল 'ফুল নেবে? এই ফুলটা দেখো, এখনও শিশিরে ভিজে আছে। কেমন টকটকে লাল!'

মেয়েটি বাবাকে বলল, 'বাবা ওই লাল ফুলটা কিনে দেবে?'

ছেলেটি বলল, 'নিন না বাবু। একদম টাটকা। আমাকে সবাই চেনে। আমি শুধুই ফুল বিক্রি করি। টাটকা ফুল।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কত দাম?'

ছেলেটা বলল, 'দিন না, আপনার যা খুশি।' বলে সে লাল ফুলটা মেয়েটির হাতে দিল। মেয়ে ফুলের গন্ধ নিল। খুশিতে মুখখানি উছলে উঠল। 'আঃ! কী মিষ্টি, পাঁচ টাকা দিলে হবে তো?'

ছেলেটা হেসে ফেলল। বলল, ‘না, না, অত লাগবে না। ফুলের দাম এক টাকা।’

মেয়েটা অবাক। ‘মাত্তর এক টাকা।’

‘বেশি কেন নেব। যা ন্যায্য তা-ই তো নেব।’

ছেলেটা এগোবে বলে পা বাড়াল। হাঁক দিল, ‘ফুল নেবে, ফুল।’

মা হঠাৎ বললেন, ‘এই ছেলে একটু দাঁড়া!’ মা ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কৌটো বার করলেন, খাবারের কৌটো। বার করলেন একটা মিষ্টি। ছেলেটাকে স্নেহের সুরে বললেন, ‘খা!’

ছেলেটা অবিশ্বাসের চোখে মায়ের দিকে তাকাল, অবাক! বলল, ‘সে কী কথা, আমাকে তো ফুলের দাম দিয়েছ, আবার মিষ্টি কেন?’

মা বললেন, ‘টাকাটা তো ফুলের, আর মিষ্টিটা মায়ের।’ ছেলেটার চোখ ছলছল করে উঠল। মিষ্টিটা নিল। দেখতে দেখতে মুখে পুরল। তাই দেখে মা, বাবা, মেয়ের সে কী খুশির হাসি।

ছেলেটার মুখখানিও হাসি-কান্নায় উছলে উঠল। সে বলল, ‘আমি এবার যাই। দেরি করলে ফুল শুকিয়ে যাবে। খদ্দের পাব না।’ সে হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল, ‘ফুল নেবে ফুল।’ দেখতে দেখতে বাবা বললেন, ‘বেচারা।’

মা বললেন, ‘এই বয়সে কোথায় পড়তে পড়তে শিখবে, খেলতে খেলতে আনন্দ করবে, তা নয় পয়সার জন্য ফুল বেচছে।’

বাবা বললেন, ‘দেখলে কেমন সৎ! ইচ্ছে করলেই পাঁচটা টাকাই নিতে পারত।’ মেয়েটি বলল, ‘বড্ড গরিব না, বাবা? মাথার টুপিটা কবেকার কে

জানে।'

বাবা মেয়েকে ঠাট্টা করে বললেন, 'একটা নতুন হলে ভালো হয় না?'

মেয়ে হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'ওমা! আমরা স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকব নাকি!'

বাবা বললেন, 'আমাদের কুলি লাগবে না। আমি সুটকেস দুটো নিচ্ছি।'

মা বললেন, 'চলো আমি ব্যাগটা নিচ্ছি।'

মেয়ে বলল, 'ওই দেখো স্টেশনের বাইরে কত এক্কা।'

এখন এক্কাগাড়িতে তিন জনে। গাড়ি ছুটছে। এদিকে-ওদিকে মানুষের আনাগোনা। সামনেই হাটবাজার। মেয়ে বলল, 'ওই দেখো টুপির দোকান।'

বাবা এক্কাওলাকে বললেন, 'ভাই একটু দাঁড়াবে?'

এক্কা দাঁড়াল, মেয়ে পছন্দ করে একটা টুপি কিনল। আবার এক্কা ছুটল।

হাটবাজারের রাস্তা। কোথাও বিক্রি হচ্ছে জামাকাপড়, কোথাও খেলনাপাতি। কোথাও টাটকা আনাজ। কোথাও খাবারদাবার।

দেখা গেল, হাটের ভিড়ে ছেলেটা হাঁটছে। ফুলের ডালিতে একটাও ফুল নেই। সব বিক্রি হয়ে গেছে।

ছেলেটাকে দেখে খাবারওলা তার নাম ধরে ডাকল, 'বালু, আজ শিঙাড়া খাবি না?'

'না, আজ আমি শিঙাড়া খাব না। আজ আমি মায়ের হাতে মিষ্টি খেয়েছি। আজ আমি ঘোড়ায় চড়ব। এখন আমি সেলিমচাচার কাছে যাচ্ছি।' বলতে বলতে হাটের ভিড়ে হারিয়ে গেল বালু নামের ফুল-বেচা সেই ছেলেটা।

সেলিমচাচা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে ঘোড়া। একটা বাদামি, একটা সাদা, একটা নীলচে। পাহাড়ে যারা বেড়াতে আসে, তারা ভাড়া নেয়।

ছেলেটাকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে এই দিকেই। ডাক দিল, 'সেলিমচাচা।'

সেলিমচাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে বালু, কী মনে করে?'

ছেলেটা বলল, 'ভাগ্যিস তোমার নীলচে ঘোড়াটা ভাড়া হয়ে যায়নি! আজ সারাদিন নীলচে আমার জন্যে।'

‘হঠাৎ! এত আনন্দ কেন? জানিস নীলচে ঘোড়াটা ভাড়া নিলে সারাদিনে কত লাগবে?’ জিজ্ঞেস করল সেলিমচাচা।

‘কত?’

‘সে আর তোমার শুনে কাজ নেই!’

‘কেন আমি কি তোমায় ভাড়ার টাকা দিইনি কোনোদিন? ইচ্ছে করলেই তোমার ঘোড়ায় চড়ি। যা চাও তা-ই দিই।’

সেলিমচাচা উত্তর দিল, ‘দু-চার টাকা দেওয়া যায়, সে তো একচক্করের ভাড়া। আর সারাদিনের ভাড়া জানিস কত? অত টাকা দেওয়ার মুরোদ নেই তোর!’

‘শুনি কত?’

‘সে আর শুনতে হবে না। বেচিস তো ফুল। ক-টা পয়সা পাস?’ জিজ্ঞেস করল সেলিমচাচা।

‘তুমি এমন করে খোঁটা দিচ্ছ কেন সেলিমচাচা? সোজাসুজি বলো কত ভাড়া নেবে। পারলে দেব।’

‘কী ব্যাপার বল তো? আজ বুঝি অনেক টাকা পেয়েছিস ফুল বেচে?’

বালু উত্তর দিল, ‘ফুল বেচে রোজ যা পাই, আজও তা-ই পেয়েছি।’

‘তবে বেশি দিবি কেমন করে?’

‘কত বেশি?’ জিজ্ঞেস করল বালু।

সেলিমচাচা বলল, ‘টুরিস্ট হলে এক-শো টাকা নিতুম। তুই ঘরের ছেলে, পঞ্চাশ টাকার কম হবে না।’

বালু অক্লেশে বলল, ‘দেব।’

সেলিমচাচা আঁতকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, ‘অ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা দিতে পারবি?’

‘পারব’।

‘বলিস কী রে! কোথায় পাবি?’

‘অতশত তোমার দরকার কী! বলেছি পারব, ব্যাস।’

‘তবে দে টাকা! নিয়ে যা ঘোড়া।’

বালু উত্তর দিল, 'সঙ্গে অত টাকা নেই, এখন ঘোড়া দাও, ফিরে এসে টাকা দেব।'

সেলিমচাচা আড়চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ওরে ছেলে, ভারি শয়তান! ফাঁকি দেওয়ার ধান্দা, ওটি হচ্ছে না।'

বালু ভয়ংকর চটে গেল, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলে উঠল, 'হচ্ছে না তো হচ্ছে না। যাও, ঘোড়া আমার চাই না।' রেগেমেগে চলেই যাচ্ছিল।

সেলিমচাচা আটকাল। আদর করে জিজ্ঞেস করল, 'রাগ করলি?'

'রাগ কেন করব!' উত্তর দিল বালু, 'আমি কি কাউকে কোনোদিন ঠকিয়েছি যে, তুমি আমায় শয়তান বললে।'

'ছিঃ ছিঃ! শয়তান বলাটা আমার ঠিক হয়নি,' সেলিমচাচার গলায় দুঃখের স্বর। 'না রে না, তোকে অত টাকা দিতে হবে না, তুই যা পারিস তা-ই দিস। নিয়ে যা নীল ঘোড়া। যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুরে বেড়া।'

বালু আনন্দে বিভোর হয়ে চিৎকার করে হেসে উঠল হা-হা-হা। নীল ঘোড়াটার পিঠে লাফ দিল। বলল, 'সেলিমচাচা তুমি কিছু ভেবো না, আমি জানি কখন ঘোড়াটার খিদে পায়। কখন তেষ্টা পায়। নীল ঘোড়াকে আমি চিনি। নীলও আমাকে চেনে। আমি চলি।' বলে ঘোড়া ছোটাল।

পাহাড়ি রাস্তা। ঘোড়ার পিঠে বালু। ছুটছে, রাস্তায় চেনা-অচেনা অনেক মানুষের আনাগোনা। একজন চেনা মানুষ বালুকে ঘোড়ার পিঠে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী রে বালু, আজ যে ঘোড়ায় চড়েছিস, কী ব্যাপার? চললি কোথা?'

বালু উত্তর দিল, 'মন চায় যেথা।'

'কী ব্যাপার হঠাৎ এত ফুর্তি কেন?'

বালু বলল, 'আজ যে আমার খুশির দিন। মায়ের হাতে মিষ্টি খেয়েছি।'

'মা? তোর? সে তো-'

বালু জবাব দিল, 'সব পরে বলব, এখন চলি।' ঘোড়া ছুটল।

ঘোড়া ছুটল বনের ভেতর।

বন পেরোলেই ঝিল। ঝিলের ধারে অনেক মানুষ। ভিনদেশি। টুরিস্ট। রকমারি রঙিন পোশাক। অনেক কচিকাঁচা। খেলা করছে। ঘোড়াটা ঝিলের জল খেল।

ঝিল ছেড়ে বালু ঘোড়া ছোটাল ধ্বংসস্তূপের দিকে। যেখানে তাঁর আস্তানা। সেখানে তার বন্ধু আছে-ভাঙা মূর্তি।

মূর্তির সামনে এসে ঘোড়া দাঁড়াল। বালু ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ঘোড়ার লাগাম একটা গাছের সঙ্গে জড়িয়ে রাখল। বলল, 'যাস না কোথাও! এক্ষুনি আসছি।'

বালু মূর্তিটার মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, 'চোখ থাকলে আজ তুমি দেখতে পেতে আমি কে! আমি আজ ঘোড়সওয়ার। আমি মায়ের হাতে মিষ্টি খেয়েছি।' বলতে বলতে নিজের মুখটা মূর্তির কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকেই খালি বলছি, আর কাউকে বলিনি, এখানে বেড়াতে এসেছে একটি ছোট্ট মেয়ে। আমি তাকে একটি ফুল বিক্রি করেছি। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাকে কেমন দেখতে, কী বললে যে ঠিক বলা হবে, আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। এখন ভাবছি, ফুলটা তাকে বিক্রি না করে এমনি দিয়ে দিলেই হত।' বলতে বলতে বালু হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, 'আমি একদম বুদ্ধু! মনের কথা বলার আর লোক পেলুম না! কার কানে ফিসফিস করছি! ইনি তো নড়েনও না, চড়েনও না। কথাও বলেন না, কানেও শোনেন না। পাথর। বরং ওর পেটের পাথরটা সরিয়ে দেখি, সেলিমচাচাকে দেবার মতো টাকা জমেছে কি না।'

বালু পাথরটা সরাল। টাকা বার করল। অবাক হয়ে বলল, 'ও বাবা, এ যে অনেক টাকা! শুধু পঞ্চাশ বলি কী করে, এ তো দু-পাঁচ-শো জমে গেছে!'

বালু টাকা গুনতে গুনতে থামল, বলল, 'না, আর গোনা যাবে না। তার চেয়ে সেলিমচাচাকে সব টাকাই দিয়ে দেব। কী হবে, আমার এত টাকার?'

আবার ঘোড়ায় চাপল বালু। আবার ঘোড়া ছোটাল। কতক্ষণই-বা লাগল সেলিমচাচার আস্তানায় যেতে।

সেলিমচাচা তাকে দেখে অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, 'কী রে এরই মধ্যে হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, এই নাও তোমার টাকা।'

সেলিমচাচা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল অত টাকা দেখে! জিজ্ঞেস করল, 'এত টাকা! পেলি কোথায়?'

'সে-কথা পরে হচ্ছে, আগে টাকাটা ধরো, গুনে নাও।'

সেলিমচাচা ফ্যালফ্যাল করে বালুর হাতের টাকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত টাকা কোত্থেকে হাতালি?'

বালু উত্তর দিল, 'ও বুঝতে পেরেছি, তুমি ভাবছ চুরি করেছি।'

'নইলে পেলি কোথায়?'

'ও তার মানে তুমি আমায় চোর বলছ! তবে শোনো চাচা, আমি যদি চোর হতুম, তোমায় টাকা তো দিতুমই না, উলটে ঘোড়াটাকেও গায়েব করে ফেলতুম। দস্তুরমতো ফুল বিক্রি করে এই টাকা জমিয়েছি, নিতে হয় নাও, নইলে যা খুশি তাই করো।'

সেলিমচাচা মুচকি মুচকি হেসে বলল, 'তুই একটুতেই রেগে যাস।'

বালু উত্তর দিল, 'আহা! খুব ভালো কথাই বললে! তুমি আমাকে চোর বলবে, আর আমি তোমায় পুজো করব। জেনে রেখো দস্তুরমতো গায়ে-গতরে খেটে জমানো আমার এই টাকা। চোর-এই বাজে কথাটা না বললে আমাকে রাগ করতে হয় না।'

সেলিম আদর করল বালুকে। আদর করতে করতে বলল, 'দুর বোকা, আমি তোকে চিনি না?'

'কথাটা কি সত্যি বলছ? এই যে আমায় বুকে জড়িয়ে আদর করছ এটা কি সত্যি আদর, না-'

বালুর কথা শুনে সেলিমচাচা বলল, 'তুই একটা পাগল। কেউ মিথ্যে মিথ্যে আদর করে নাকি?'

'কেমন করে বুঝব তোমার আদর মিথ্যে নয়?'

'আমিও-বা কেমন করে বোঝাব আমার আদর সত্যি!'

'আমার একটা আবদার তুমি মেনে নিলে আমি বুঝব তোমার আদর মিথ্যে নয়, সত্যি।'

'কী আবদার শুনি?'

'কাল আর এক বার তোমার ঘোড়াটা আমার চাই।'

সেলিমচাচা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাল আবার কেন?'

'আমার সেই ছোট্ট বন্ধুকে খুঁজব।' উত্তর দিল বালু। 'মা-বাবার সঙ্গে সে এখানে বেড়াতে এসেছে। সেই যে তার এক বার দেখা পেয়েছি, তার পর

থেকে আর তাকে দেখছি না। ঘোড়ায় চেপে এদিক-ওদিক তাকে খুঁজব। বলো, রাজি?'

সেলিমচাচা বলল, 'রাজি না হয়ে উপায় আছে? ঠিক আছে তা-ই হবে।'

সেলিমচাচাকে আনন্দে আচমকা জড়িয়ে ধরে বালু চিৎকার করে উঠল, 'হুররর রে!'

*

একটা হোটেল। নামকরা। দেখা গেল মা, মেয়ে, বাবা গল্প করছেন। বাবা মেয়ের চিবুক ছুঁয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'টুপি তো কিনলে, এবার দেবে কাকে?'

মেয়ে উত্তর দিল, 'যার জন্যে কিনলুম, তাকেই দেব।'

'এতবড়ো শহরে তাকে পাবি কোথায়?'

মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা কিচ্ছু জান না, ও রোজ সকালে টাটকা ফুল নিয়ে নিশ্চয়ই স্টেশনে বেচতে আসে। সেখানেই দেখা হয়ে যাবে। আমরা তো আর মাত্তর দুটো দিন থাকব। কে বলতে পারে কোথাও-না-কোথাও আজও দেখা হয়ে যেতে পারে। টুপিটা কাছেই রাখব। দেখা পেয়ে গেলে দিয়ে দেব। তবে আমি বলছি, কাল স্টেশনে দেখা হবেই।'

মেয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরের দিন সকালে মা-বাবার সঙ্গে মেয়ে স্টেশনে বেড়াতে গেল। সকালের ট্রেন তখনই স্টেশনে ঢুকেছে। যাত্রীদের হুটোপাটিতে প্ল্যাটফর্ম উপচে পড়ছে। সেই ভিড়ের মধ্যে বালুর গলা শোনা গেল। সে চ্যাঁচাচ্ছে, 'ফুল নেবে ফুল, রঙিন ফুল।'

বাবা শুনতে পেয়েছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'এসেছে, ছেলেটা এসেছে!'

মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কই?'

মেয়ে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ না, ওই তো হাঁক দিচ্ছে।' তারপর আদর করে বলল, 'মা, আজও আমি একটা ফুল কিনব।'

বাবা হেসে ফেললেন, হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি আজও তুমি আমার পাঁচটা টাকা খরচ করাবে।'

মা-ও হাসলেন, বাবাও হাসলেন, হাসল মেয়েও।

স্টেশন ফাঁকা হতে শুরু করেছে।

বালু দেখতে পেয়েছে, চেঁচিয়ে উঠেছে, 'তোমরা দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি।' ছুটল। ছুটতে ছুটতে ওদের তিন জনের সামনে এসে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে। অস্থির হয়ে তার ফুলের ডালি হাতড়ে একটা টাটকা ফুল বার করে মেয়েটিকে বলল, 'এ-ফুলটা তোমার। ভেবো না যেন এ-ফুলটার আমি দাম নেব! আসলে আমি তোমায় এমনি এমনি দিচ্ছি।'

মেয়েটি ফুলটা হাতে নিল। নিয়ে বলল, 'দাম না নিলে, তোমার লোকসান হবে যে!'

'কিচ্ছু হবে না।'

'তাহলে আমিও তোমায় একটা জিনিস এমনি এমনি দেব।' বলে মায়ের হাতে সেই যে নতুন কেনা টুপিটা ছিল, সেটা নিল। বলল, 'তোমার মাথার ওই টুপিটা বড্ড পুরোনো। তোমার জন্যে একটা নতুন টুপি কিনেছি! এই দেখো।'

বালু হতবাক হয়ে তার হাতের দিকে তাকিয়ে রইল মুহূর্তে। তারপর আচমকা হো হো করে হেসে উঠল। আনন্দে উচ্ছল হয়ে ফুলসুদ্ধ ফুলের ডালিটা আকাশের দিকে ছুড়ে দিল। যে ক-টা ফুল তখনও ডালিতে ছিল, সে ক-টা সকলের মাথা ছুঁয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। নিজেই পুরোনো টুপিটা মাথা থেকে খুলে বালু নিজের জামার পকেটে পুরে ফেলল। তারপর খুশি খুশি গলায় বলল, 'দাও, নতুন টুপিটা আমার মাথায় পরিয়ে দাও।'

মেয়েটি পরিয়ে দিল। বালু তখন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমায় এখন কেমন দেখতে লাগছে বলো?'

মা বললেন, 'খুব সুন্দর, ঠিক রাজপুত্তুরের মতো।'

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন।

বালু আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি রাজপুত্তুর।' তারপর ছুটল; ছুটতে ছুটতে বলল, 'তোমরা যেয়ো না কোথাও! আমি এখুনি আসছি।'

কোনদিকে? কোথায় ছুটল?

সেলিমচাচার কাছে। সেলিমচাচার আস্তানায়, সেলিমচাচার সামনে এসে দাঁড়াল সে। হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'এই দেখো আমার মাথায় নতুন টুপি!'

'কে দিল?'

‘আমার বোন-রাজকন্যা। আমি রাজপুত্তুর। ঘোড়াটা দাও।’

‘কোথায় যাবি?’

‘ঠিক নেই,’ বলতে বলতে বালু ঘোড়া ছোটাল। ঘোড়া ছুটতে ছুটতে স্টেশনেও পৌঁছে গেল। যাদের বলে গিয়েছিল, ‘তোমরা যেয়ো না কোথাও, আমি এখুনি আসছি।’ তারা ভোঁ ভাঁ, স্টেশনের আনাচেকানাচে কোথাও নেই।

ছুটতে ছুটতে এদিকে ঘোড়াটা ভীষণ হাঁপিয়ে গেছে। বালু তার গায়ে হাত বোলাল, আপনমনে বলল, ‘বেচারা হাঁপিয়ে গেছে। তেষ্টাও পেয়েছে নিশ্চয়ই। যাই ঝিলের ধারে। একটু জল খাইয়ে আনি।’

বালুকে পিঠে নিয়ে ঘোড়া হাঁটল ঝিলের দিকে।

ওই তো পৌঁছে গেছে ঝিলের ধারে। ও বাবা, এখানে এত লোক কেন?

কেন আবার, জান না? এখানে যে শীতের সময় দুপুররোদে বেড়াতে আসে দল বেঁধে ছোটো-বড়ো সবাই। ওই দেখো না, একদল ছেলে-মেয়ে গান গাইছে, তো আর একদল নাচছে। দেখতে পাচ্ছ না, সার-সার কতগুলো দোলনা? ও কী, ও কী! একটা দোলনায় ও কে দুলছে? সেই মেয়েটা না? ওই তো কাছেই তার মা আর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

বালুর অবশ্য এখনও ওদিকে নজর পড়েনি। দোলনা দুলছে, বালুও ঘোড়ার পিঠ থেকে নামছে। নেমে ঘোড়াকে ঝিলের জল খাওয়াচ্ছে।

মেয়েটি কিন্তু দেখতে পেয়েছে। চটপট দোলনা থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, ‘বালু-উ-উ-উ!’ দোলনা থেকে নেমে বালুর দিকে ছুটে গেল।

বালুর মুখখানা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। বলল, ‘তোমাকে আমি কখন থেকে খুঁজছি, এই যে দেখছ ঘোড়াটা, এটা তোমার। তুমি চড়বে বলে আমি সেলিমচাচার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।’

মেয়েটি বলল, ‘আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি না।’

বালু বলল, ‘কেন পারবে না! আমি ধরছি।’

মেয়েটির মা-বাবা তাদের দেখতে পেয়েছেন। বাবা দূর থেকে ডাক দিয়েছেন মেয়ের নাম ধরে, ‘তিতু-উ-উ-উ!’ ডাকতে ডাকতে মা আর বাবা এদিকে আসছেন।

বালু বলল, ‘তোমার বাবা তোমায় ডাকছেন। তোমার নাম বুঝি তিতু। খুব ভালো নাম।’

মেয়ে বলল, ‘তোমার নামটাও ভালো, বালু।’

বালু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘আমার নামটা তুমি জানলে কেমন করে?’

‘সেই যে তখন কে একজন তোমার নাম ধরে ডাকল।’

তিতুর মা আর বাবা এসে পড়েছেন। বাবা বালুকে বললেন, ‘কখন থেকে তোকে আমরা খুঁজছি, কোথায় গিয়েছিলি?’

বালু উত্তর দিল, ‘আমি গেছলুম সেলিমচাচার কাছে, ঘোড়া আনতে। আমিও তো ঘোড়ায় চেপে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার কী ভাগ্য! ঘোড়াটার জলতেষ্টা পেল। ওকে জল খাওয়াতে ঝিলে এলুম, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিতু আমায় নতুন টুপি দিয়েছে। আমি এবার তিতুকে ঘোড়ার পিঠে নিয়ে এদিক-ওদিক বেড়াব।’

তিতুর মুখখানা ভয়ে শুকিয়ে গেল। বলল, ‘না, না, আমি ঘোড়ার পিঠে চাপব না, আমায় ভয় করবে।’

বালু সাহস দিল। বলল, ‘কিচ্ছু ভয় নেই। তুমি আমায় ধরে থাকবে।’

মা বললেন, ‘বলছে যখন দেখো-ই না, পাহাড়ে এলে সবাই ঘোড়ায় চাপে।’

বাবাও বললেন একই কথা। বললেন, ‘প্রথমটা অবশ্য একটু ভয় ভয় করবে। তারপরে দেখবি ঠিক হয়ে গেছে। তবে দেখিস বাবা, বেশি দূরে যাস না।’

বালু উত্তর দিল, 'না, না, কাছাকাছিই থাকব, নাও তিতু ওঠো!'

তিতুর যে ইচ্ছে ইচ্ছে করছিল না, তা বলব না। তবে একটু একটু ভয়ও করছিল। তাই ঘোড়া যখন ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করল, তখন তিতু ফিরে ফিরে বাবা-মাকে দেখছিল ভয়ে ভয়ে। তারপর ঘোড়া যখন ছুটল, তখন বালু চেঁচিয়ে তিতুর মাকে বাবাকে বলল, 'আপনারা ঝিলের ধারে থাকুন, আমি এখুনি আসছি।'

ঘোড়ার পিঠে বসে নিমেষে বালু আর তিতু ওই দূর পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

এবার মা ভয় পেলেন। বললেন, 'ছেড়ে তো দিলুম! কিছু হবে না তো?'

বাবা উত্তর দিলেন, 'না না, ছেলেটা খুব সরল।'

ধ্বংসস্তূপের সামনে এসে ঘোড়া দাঁড়াল, তিতু জিজ্ঞেস করল, 'এখানে দাঁড়ালে কেন?'

'এই তো আমার বাড়ি।' উত্তর দিল বালু ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে নামতে। তারপর তিতুকে নামতে সাহায্য করল। মাটিতে পা ফেলেই তিতু বলল, 'একী! এ তো দেখছি জঞ্জালে ভরা।

বালু উত্তর দিল, 'এখানেই আমি থাকি, এসো।' তিতুকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভাঙা মূর্তিটার সামনে দাঁড়াল।

'এ কার মূর্তি?' অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল তিতু।

'এ-ই তো আমার আপনজন,' বলে বালু পাথরের ভাঙা মূর্তিটাকে হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরল, তারপর মূর্তিটার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'দেখো, দেখো, তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে! আমার নতুন বন্ধু তিতু।'

বালুর কাণ্ড দেখে তিতু হেসেই ফেলল। মনে মনে ভাবল এক্কেবারে পাগল ছেলে। তারপর হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা-বাবাও বুঝি এখানেই থাকেন?'

বালু আনন্দ করতে করতে কেমন যেন চুপসে গেল। তারপর তিতুর কাঁধে হাত রাখল। কী যেন ভাবল। তারপরে বলল, 'তিতু, তোমার মাকে বলো না আমার মা হতে।'

তিতু চমকে উঠল। বালুর অসহায় চাহনি দেখে তারও চোখদু-টি ছলছল করে উঠল। তিতু কান্নাভেজা গলায় উত্তর দিল, 'চলো বালু, তবে মায়ের

কাছে ফিরে যাই। মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। আমি তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব কলকাতায়।'

বালু আনন্দে উচ্ছল হয়ে বলল, 'হ্যাঁ তাই চলো।' বলে তিতুর হাত ধরল।

না, বালুর যাওয়া হল না। হুটোপুটি করে বেরোতে গিয়ে কেমন যেন অসাবধানে বালুর জামার একটা কোণ ভাঙা মূর্তির ভাঙা হাতে আটকে গেল। বালু চকিতে ফিরে তাকাল মূর্তিটার দিকে। তার পরমুহূর্ত মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে জড়িয়ে ধরল মূর্তিটাকে। জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'না, না, না, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কিছুতেই না।'

ফিরে এসেছিল তিতুরা কলকাতায়।

ফুলের ডালি নিয়ে এখনও বালু ফুল বিক্রি করে সেই পাহাড়ি দেশে। এখনও তার সেই মিষ্টি সুরের হাঁক শোনা যায়, 'ফুল নেবে ফুল, রঙিন ফুল!' তবে, এখন যেন মনে হয় তার গলাটা একটু একটু ভেঙে গেছে।

যখন আমরা খুব ছোটো থাকি, তখন মনে কত কী ইচ্ছে জাগে বলো! কারও ইচ্ছে উড়োজাহাজ ওড়াবে। কেউ-বা চায়, হাতির পিঠে চড়বে। কেউ-বা ভাবে, টিভিতে নাটক করবে। এমনই হাজারও ইচ্ছে তেমন উপচে যায়।

কিন্তু ওই ছোট্ট মেয়ে নিনা, তার মনে কী ইচ্ছে জাগে? সে ছবি আঁকবে।

নিনা সত্যিই ছোট্ট। মানে, হয়তো তোমার মতো। তার মা আছেন। বাবা আছেন। একটা ছোট্ট ভাই আছে। আর আছে তাদের একটা ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির সামনে পেছনে অনেক গাছ। অনেক পাখি।

নিনা ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করে। ছুটে ছুটে এদিকে যায়। ওদিকে লুকোয়। না হয়, গাছ দেখে সবুজ সবুজ। নয়তো পাখি দেখে হরেক রঙিন।

সেদিন হল কী, সে ভাইয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল। খেলতে খেলতে ভাই এমন তাড়া দিল, নিনা চোখ-কান বুজে দিল ছুট। লুকিয়ে পড়ল একটা অচেনা বাড়ির পেছনে। ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকল সেখানেই। অনেকক্ষণ। ভাই বোধ হয় আর তাকে খুঁজে পাবে না।

নাই পাক, তবু সে হুট করে বেরোল না। 'টুকি-ই-ই' বলে জানানও দিল না। কিন্তু একটা অন্য কাণ্ড ঘটে গেল। খুক খুক করে কে যেন কেশে উঠল।

কাশির শব্দ কানে যেতেই ধড়ফড় করে উঠেছে নিনার বুকের ভেতর। চমকে তাকিয়েছে সে। দেখতে পেয়েছে একটা জানালা। খোলা। মনে হয়েছে তার, ওই ঘরে কেউ আছেন।

দেওয়ালের সঙ্গে সিঁটিয়ে রইল নিনা। আর ট্যারা চোখে দেখতে লাগল জানালাটা ফিরে ফিরে। অবশ্য, আর কোনো শব্দ শুনতে পেল না নিনা।

এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল, জানালায় উঁকি মেরে দেখলে হয় না, কেউ আছেন কি না!

কিন্তু খোলা জানালা দিয়ে অচেনা কারও বাড়িতে যে উঁকিঝুঁকি দিতে নেই, এটা জানে নিনা। সুতরাং সে এগোল না।

কিন্তু আবার শোনা গেল সেই কাশির শব্দ। খুক খুক। এবার একটু জোরে। আর, ঠিক তখনই তার মনে হল, এ-শব্দ কোনো বুড়োমানুষের গলার। তাই আবার তার মনে হল, উঁকি মেরে দেখি!

না, সে নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। সে আলতো পায়ে ডিঙি মেরে এগিয়ে গেল। ওই জানালার কাছে গিয়ে চুপিসারে উঁকি দিল। তারপরেই সে থমকে গেল জানালার গ্রিলে মুখ ঠেকিয়ে। কেননা, তার নজরে পড়ল, একজন বুড়োমানুষ পেছন ফিরে বসে ছবি আঁকছেন। একটা মস্ত কাপড়ের ওপর। অনেক পাখির ছবি। আকাশে উড়ছে। আকাশ নীল। সাদা মেঘ ভাসছে। পাখির রঙে আকাশ ঝলমল করছে। এমন যিনি ছবি আঁকছেন তাঁর পিঠ দেখা যায়। হাত দেখা যায়। কিন্তু মুখ দেখা যায় না। তাঁর মুখখানা দেখার জন্য ছপফট করছিল নিনার মন। কিন্তু তিনি মুখ ফেরালেন না। জানতেও পারলেন না, নিনা নামের একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জানালায়। সে-ও ভালোবাসে ছবি আঁকতে। কিন্তু তেমন পারে না। সে যেন হিজিবিজি। বিচ্ছিরি।

আর বেশিক্ষণ দাঁড়াল না নিনা। লুকিয়ে থাকা আর হল না তার। সে ভাইয়ের কাছে ধরা দিল। ফিরে গেল ঘরে। আর মনে মনে ভাবতে লাগল, আহা রে, আমিও যদি অমন ছবি আঁকতে পারতুম।

এক দিন নয়, দু-দিন নয়, পর পর তিন দিন নিনা সেই জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পর পর তিন দিন সে দেখল মানুষটির হাত রঙে তুলি ডুবিয়ে ছবি আঁকছে সে হাত। কিন্তু একটি বারের জন্যও সে নিনার দিকে ফিরে তাকাল না। দেখতে পেল না নিনা তাঁর মুখখানা এক পলকের জন্য। কে জানে, মানুষটা কেমন। রাগী রাগী না হাসিখুশি! তা, মুখ না দেখলে কেমন করে জানতে পারবে? তবে মানুষটা রাগী রাগী হলে, নিনাকে এই জানালার ধারে দেখলে তিনি যে ছেড়ে কথা বলবেন না, সে একটা পুঁচকে ছেলেও জানে। কিন্তু নিনাকে দেখে তিনি যদি মুচকি হাসেন, হাসতে হাসতে যদি বলেন, 'জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কেন, এসো ঘরে এসো,' তখন?

তখন কী আনন্দ হয় বলো! নিনাকে ডেকে তাঁর পাশে বসিয়ে তিনি যদি বলেন, 'তোমার ছবি দেখতে ভালো লাগে?' নিনার তখন উত্তর দিতে আটকাবে না, 'খুউব।' হয়তো বলেও বসবে, 'আমারও ইচ্ছে করে ছবি আঁকতে, তবে ভালো পারি না।'

তখন আবার যদি তিনি বলেন, 'আমি তোমায় শিখিয়ে দেব।' তাহলে তো নিনার খুশির শেষ থাকে না।

তবে এখন এত কথা ভাবার কোনো মানেই হয় না। কারণ, তিনি নিজের মনে ছবিই আঁকছেন। ফিরে তাকাচ্ছেনই না। নিনাকে ঘরে ডাকার কথা ছেড়েই দাও।

সেদিন হল কী, একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেল রাস্তায়। নিনা ইশকুলে যাচ্ছিল আপনমনে। হঠাৎ কোথায় ছিল একটা বেড়াল। কোত্থেকে ছুটে এসে আচমকা একেবারে নিনার পায়ের ভেতর! নিনা ভয়ে-ময়ে চিৎকার করে উঠছে, 'বাবা রে!' তারপর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে, সাদা তুলতুলে লোমভরতি একটা বেড়াল!

যাক বাবা পায়ের নীচে বেড়াল, অন্য কিছু নয় এই যা রক্ষে। বলতে নেই, বেড়ালটা আঁচড়-কামড় কিছুই দিল না। উলটে মিঁয়াও মিঁয়াও করে নরম গলায় ডাক দিল। নিনাও 'যা, যা,' বলে হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিল। সত্যি, ভারি মোলায়েম তার গা-টা। ঠেলে দিয়েই আবার হাঁটা দিল।

ওমা! বেড়ালটাও যে নিনার পিছু পিছু হাঁটে। হাঁটে আর মিঁয়াও মিঁয়াও ডাকে! এ তো ভারি বিপদের কথা! নিনার পিছু ছাড়ে না যে সে। সে এখন কোথায় যাবে নিনার সঙ্গে। নিনা যে এখন ইশকুলে যাচ্ছে!

তা ইশকুলে যাও, আর যাই করো, বেড়ালও চলল তোমার সঙ্গে।

অগত্যা নিনা ছুট দিল।

বেড়ালও ছুট দিল।

নিনা ছুটতে ছুটতে গেট পেরিয়ে ইশকুলে ঢুকে পড়ল।

বেড়ালও ঢুকে পড়ল।

দরোয়ান চেঁচিয়ে উঠল, 'বেড়াল, বেড়াল!'

আর, বলব কী, সারা ইশকুলে তখন তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

বেড়াল ছোটে।

ইশকুলের মেয়েরা ছোটে।

দিদিমণিরা ছোটে।

দরোয়ান চ্যাঁচায়।

বইপত্তর ছড়িয়ে যায়।

চেয়ার-টেবিল উলটে যায়।

সে এক নৈরেকার কাণ্ড!

শেষমেশ ধরা পড়ল বেড়াল।

বেড়ালকে ধরে বাইরে ফেলে দিল দরোয়ান। গেট বন্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত গেটের বাইরে বেড়ালটার যে কী হল, কেউ জানতে পারল না। তবে ইশকুলের ওলট-পালট চেয়ার-টেবিল, আবার গোছানো হল। ছড়িয়ে পড়া বইপত্তর কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েরা বেঞ্চে বসল। যেন এতক্ষণ যুদ্ধ হচ্ছিল ইশকুলের ভেতর বেড়ালের সঙ্গে। অবিশ্যি সে-যুদ্ধে বোমা পড়েনি, রকেটও ওড়েনি। খালি শোনা গেছে চিৎকার আর বেড়ালের মিঁয়াও, মিঁয়াও ডাক! সে যেন এক মজার যুদ্ধ!

যাক সারাটা দিন আর তেমন কিছু হল না। শান্তিতে সবাই পড়াশোনা করল। এমনকী, বেড়াল নিয়ে তেমন কথাবার্তাও শোনা গেল না। ছুটির পর যে যার বাড়িও চলে গেল নির্ঝঞ্ঝাটে!

কিন্তু যেতে পারল না নিনা। সারাদিন ইশকুলের বাইরে কোথায় যে বেড়ালটা ছিল কে জানে! নিনাকে দেখামাত্তর আবার তার পিছু নিল। চলল তার সঙ্গে যেদিকে নিনা যায়, সেই দিকেই।

নিনা এখন যায় বাড়িতে। অন্যদিকে তো এখন তার যাওয়ার কথা নয়! সুতরাং বেড়ালও তার সঙ্গে বাড়ি চলল।

এবার আর ছুটল না নিনা। এবার সে ভয়ও পেল না। তার যেন কেমন মনে হল। মনে হল বেড়ালটা নিশ্চয়ই কারও পোষা। পথ হারিয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে!

কার বেড়াল রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে সে-কথা নিনা ভাবলেও আশ্চর্য, যার বেড়াল তার কোনো হেলদোল নেই! তুমি বেড়াল পুষেছ, অথচ তার জন্য তোমার মন কেমন করছে না! কিন্তু নিনাই-বা কী করবে! সে তো আর বেড়াল নিয়ে কার বেড়াল, কার বেড়াল বলে এর দোরে, তার দোরে ছুটোছুটি করতে পারে না! তা ছাড়া এ কি সোজা কাজ! মুখে বলা যায়, কিন্তু এত বড়ো শহরে দরজার কী শেষ আছে! ভাবল, বেড়ালটাকে সে বাড়িতেই নিয়ে যাবে। নিজেই পুষবে। সে তো বিপদে পড়ে অন্য কারও পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করেনি। নিনার মুখখানি দেখে নিশ্চয়ই বেড়ালের মনে হয়েছে, মেয়েটা দয়ালু। বিপদ থেকে সে-ই তাকে বাঁচাতে পারে!

শেষমেশ বেড়ালটা নিনার সঙ্গে নিনাদের বাড়িতেই ঢুকল। ঢুকলেও কি নিস্তার আছে! মা তো দেখেই আঁতকে উঠলেন। তবে, মা তো খুব ঠান্ডা মানুষ। একেবারেই হাঁকডাক বেরোয় না তাঁর মুখ দিয়ে। খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞসা করলেন, 'বেড়ালটা কোত্থেকে আনলি? কে দিল?'

নিনা উত্তর দিল, 'না মা, কেউ দেয়নি। কোত্থেকে এল তা-ও জানি না। কী ওর মনে হয়েছে কে জানে, তখন থেকে আমার পায়ে পায়ে ঘুরছে। এমনকী আমার পিছু পিছু ইশকুলেও ঢুকে পড়েছিল। তারপর বেড়াল নিয়ে ইশকুলে কী হুলস্থুল কাণ্ডটাই তা হল।'

মা বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে কারও পোষা বেড়াল।'

নিনা জিজ্ঞাসা করল, 'হারিয়ে গেছে বোধ হয়, না মা?'

মা এবার একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন, 'হবে হয়তো।'

নিনা বলল, 'যার বেড়াল, তিনি হয়তো এখন অনেক খোঁজাখুঁজি করছেন। তাই না?'

মা জবাব দিলেন, 'করবেনই তো।'

'তাহলে কী হবে?'

মা উত্তর দিলেন, 'তাহলে এখন ওকে একটু দুধ খাওয়াতে হবে। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। দেখছিস না, কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে।'

সত্যি মায়েরা কারও মুখ দেখলেই কেমন করে যে মনের কথা বুঝতে পারেন কে জানে! কেননা, চোখের পাতা পড়ার আগেই মা একবাটি দুধ নিয়ে এলেন। আনতেই বেড়ালটা একেবারে হামলে পড়ল। দেখতে দেখতে একবাটি দুধ শেষ করেও ফেলল। তারপরে সেই ঝিমিয়ে পড়া বেড়াল আবার চনমন করে উঠল। শেষ পর্যন্ত বেড়ালটা নিয়ে যে কী হবে, কে জানে। তবে এখন যে সে নিনা আর তার ভাইয়ের সঙ্গী হয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করবে, এটা না বললেও কে না জানে!

তাই এখন নিনা বইয়ের ব্যাগ রেখে ইশকুলের পোশাক ছেড়ে, বিকেলের জলখাবার খেয়ে নিল চটপট। তারপর বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে ছুটল বাইরে। এখন নিনার ভাই বাড়িতে নেই। কোথায় যে গেছে তা-ও কেউ জানে না। ইশকুল থেকে বাড়ি ফিরে অবধি নিনা তাকে দেখতে পায়নি। তাই সে বেড়াল নিয়ে, বাইরে বেরিয়ে দু-চার বার ডাক দিল ভাইয়ের নাম ধরে। সাড়া পেল না। এমন সময় হঠাৎই তার মনে পড়ে

গেল সেই ছবি আঁকিয়ে মানুষটির কথা। মনে পড়ে গেল বলেই, বেড়ালটাকে কোলে নিয়েই সে পৌঁছে গেল সেই মানুষটির ঘরের জানালার ধারে।

হ্যাঁ, যা ভাবা ঠিক তাই, মানুষটি ছবি আঁকছেন। আপন মনে, পেছন ফিরে।

নিনাও দেখতে লাগল জানালায় মুখ ঠেকিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে।

এমন সময় হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, নিনার কোলের বেড়ালটা আচমকা ডেকে উঠেছে, ম্যাঁও।

এই রে! কী সর্বনাশ! নিনা থতোমতো খেয়ে গেছে। সে বোধ হয় ছুটে পালাবে। কিন্তু সে পালাবার আগেই বেড়ালটা তার কোলের ওপর থেকে মেরেছে এক লাফ। মেরেই জানালা গলে সিধে ঘরের ভেতর। ছবি আঁকিয়ে চমকে পিছু ফিরেছেন।

নিনা থমকে গেছে।

বেড়াল লাফিয়ে ছবি আঁকিয়ের কোলে উঠে পড়েছে।

ছবি আঁকিয়ে অবাক গলায় বেড়ালটাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোথায় ছিলি এতক্ষণ?’

নিনা দেখেশুনে থ। সে পালাতে গিয়েও পালাতে পারল না। কেননা, ছবি-আঁকিয়ে তাকে দেখে ফেলেছেন! এমন নরম চোখ দু-টি ছবি-আঁকিয়ের! ভারি ভালো লেগে গেল নিনার। নিনা ছবি-আঁকিয়ের কথা শুনে বুঝতেই পারল, বেড়ালটা তাঁর।

বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ছবি-আঁকিয়ে। এগিয়ে এলেন জানালার ধারে নিনার কাছে। এবার নিনার এক বারও মনে হল না, সে ছুটে পালায়। বরং সে খুব মৃদু স্বরে বলে উঠল, 'বেড়ালটা বোধ হয় রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। আমার পিছু পিছু ঘুরছিল। ওকে আমিই নিয়ে এসেছি।'

'তুমি কে?'

'আমি নিনা।'

'তুমি কেমন করে জানলে, বেড়ালটা আমার?'

'আমি জানতাম না।'

'তবে?'

'আমি জানতাম আপনি ছবি আঁকেন। সেদিন হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম আপনাকে ছবি আঁকতে এই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। আপনার ছবি আঁকা দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমিও যদি আঁকতে পারতুম! তাই আজও এসেছিলুম আপনার ছবি আঁকা দেখতে, কুড়িয়ে পাওয়া বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে। বেড়ালটাই আমার কোল থেকে লাফিয়ে আপনার কোলে উঠেছে!'

তিনি হাসলেন নিনার কথা শুনে। বললেন, 'তুমি তো ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। এসো, আমার ঘরে এসো! আমি তোমায় শিখিয়ে দেব ছবি আঁকতে। তার বদলে একটি কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'আমার এই দুষ্টু বেড়ালটার সঙ্গে খেলা করতে হবে। আমি জানি ও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে খেলা করলে, ও আর দুষ্টুমি করবে না। তোমার মতো লক্ষ্মী হবে।' বলে তিনি ঘরের দরজা খুলে দিলেন। তারপর নিনার হাত ধরে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন। নিনা জানালা ছেড়ে ঘরে ঢুকল। তার চোখে পড়ল ঘরের চার দেওয়ালে ভরতি শুধু ছবি। কত রং!

নিনার চোখ জুড়িয়ে গেল। নিনা বলল, 'আমার ছোট্ট ভাইটাও ছবি আঁকে। তবে সে আর ছবি হয় না। শুধু রং ছড়ায়। খাতা ভরতি রং!'

ছবি-আঁকিয়ে বললেন, 'তাকেও নিয়ে এসো আমার কাছে। আমি তাকেও ছবি আঁকতে শিখিয়ে দেব।'

'সত্যি?' ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল নিনা।

‘নিশ্চয়ই।’ উত্তর দিলেন তিনি।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে নিনা বলল, ‘তাহলে তো খুব ভালো হয়। আমরা দু-জনে ছবি আঁকা শিখব আপনার কাছে, আর এই দুষ্টু বেড়ালটার সঙ্গে খেলা করব। তখন কী মজা হবে বলুন!’ বলতে বলতে নিনা বেড়ালটার গালটা টিপে নরম গলায় ধমক দিল, ‘দুষ্টু!’

ছবি-আঁকিয়ে হেসে ফেললেন।

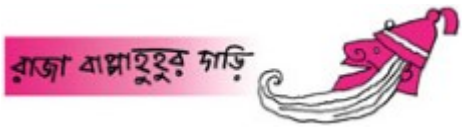

রাজা বাপ্পাহুহুর তিন রাত্তির চোখে ঘুম নেই। কেন যে ঘুম নেই, সেই কথাটি কেউ জানে না। কারণ তিনি তো রাজা। রাজপ্রাসাদের নিদমহলে তিনি সোনার পালঙ্কে যখন গা এলিয়ে শুয়ে পড়েন, তখন সেখানে কেউ ঢুকতেই পারে না। ঢোকার কথা ছেড়েই দাও, ঘরের আশপাশে ফিসফাস শব্দ, কিংবা খুটখাট আওয়াজ হলেই ব্যস, গর্দানটি ঘ্যাঁচাং! কিন্তু রাজার খবর সে কি আর চাপা থাকে! যতই ঢাকঢাক-গুড়গুড় কর, রাজা বাপ্পাহুহুর যে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ঘুম চলে গেছে, সেটা সবাই জানতে পেরেছে।

কী ব্যাপার বলো তো? ব্যাপার আর কী, সেদিন ছিল রাজা বাপ্পাহুহুর জন্মদিন। তিনি তো সাজগোজ করে হাতির পিঠে চেপে শহরে বেরিয়েছেন প্রজাদের দর্শন দেবার জন্য। রাজার জন্মদিনের শোভাযাত্রা বুঝতেই পারছ কী এলাহি কাণ্ড! তাঁর হাসি মুখখানি প্রজারা দেখছে আর তিনি প্রজাদের হাসি মুখ থেকে জয়ধ্বনি শুনছেন, 'রাজা বাপ্পাহুহু যুগ যুগ বেঁচে থাকো, যুগ যুগ বেঁচে থাকো।' ওঃ। সে কী খুশির হুল্লোড়। সেই জয়ধ্বনি শুনে রাজা বাপ্পাহুহুর আনন্দে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একটা কথা যতবারই তিনি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছেন, ততবারই সেই কথাটা মনটাকে খামচে ধরছে। উফ! কী মুশকিল! হয়েছে কী, তিনি যখন হাতির পিঠে চেপে রাজপ্রাসাদের সিংদরজা পেরিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন, ঠিক তখনই একটা কটা-চোখো, কালো বেড়াল ফ্যাঁচ করে হেঁচে একেবারে রাজার নাকের সামনে তিড়িং করে লাফিয়ে পড়েছে। ছ্যাঁত করে চমকে উঠেছেন রাজা। তিনি খ্যাঁক করে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই বিল্লিমশাই লেজ পাকিয়ে দে ছুট! কালো বেড়াল তার ওপর কটা চোখ, কী অযাত্রা, কী অযাত্রা! ছিঃ ছিঃ! জন্মদিনটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি!

যাক গে, যাক গে, যা হবার সে তো হয়েই গেছে। এখন আর ভেবে কী লাভ। বরঞ্চ এখন তিনি যা করছেন তাই করুন-হাতির পিঠে বসে পথে পথে ঘুরুন আর দাড়িতে হাত বোলান। থুড়ি, থুড়ি, একদম ভুল হয়ে গেছে। রাজা বাপ্পাহুহু দাড়িতে হাত বোলাবেন কেমন করে! তাঁর তো গোঁফও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে চাঁচাপোঁছা! মানে ভগবান রাজাকে দাড়ি-গোঁফ কিছুই দেননি। কিন্তু এই চাঁচাপোঁছা দাড়িই যে কাল হবে, সে আর কে জানত! হয়েছে কী, রাজা তো চলেছেন পথের মাঝখান দিয়ে।

যেদিকে চোখ যায় শুধু মাথা আর মাথা। কালো মাথা, সাদা মাথা, কালো-সাদা ঢাকা মাথা। ওরই মধ্যে একটি ছোট্ট মাথার ছোট্টছেলে এর হাতের ফাঁক দিয়ে, ওর ঘাড়ের ফোকর দিয়ে ঠ্যাং লেংচে রাজার দিকে উঁকি মারছে। সে তো এর আগে আর কখনো রাজাকে দেখেনি, তাই সে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে মুখখানা বিচ্ছিরি করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ আবার কী রাজারে! রাজার দাড়িই নেই! রাজা না হাতি।'

ইস দেখো কাণ্ড। চুপ-চুপ-চুপ! আর চুপ! কথাটা রাজা বাপ্পাহুহুর কানে ঠিক পৌঁছে গেছে। সঙ্গেসঙ্গে হাসিহাসি মুখখানা তাঁর হাঁড়ি-হাঁড়ি হয়ে গেল। ফোলা-ফোলা গাল দুটো তাঁর ফাটা বেলুনের মতো চুপসে-ফুস! অপমানে মাথার টিকি থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে ফুঁসতে লাগলেন, কী আস্পর্ধা! তাঁর দাড়ি নেই বলে একটা পুঁচকে ছেলে তাঁকে বলল, রাজা না হাতি! রাজা বাপ্পাহুহু আচমকা হাঁক পাড়লেন, 'হাতি রোখো, ফিরে চলো রাজপ্রাসাদে, আমার জন্মদিন নেহি হোগা।'

সঙ্গেসঙ্গে হাতি পিছু ফিরল। অত হাসি, অত আনন্দ, নিমেষে ফোক্কা। বোঝো ঠেলা। সেই যে রাজার মাথায় ঢুকল 'দাড়ি নেই, দাড়ি নেই' এই নেই-নেই করতে করতেই তার চোখে তিন-রাত্তির ঘুমও নেই। কে জানে বাবা, কালো বেড়ালের কোপ বুঝি শুরু হয়ে গেল!

তিন-রাত্তির পেরুতেই রাজা বাপ্পাহুহু আর থাকতে পারলেন না। হুকুম করলেন, 'বোলাও মন্ত্রীকে। ডাকো সভা।'

রাজার হুকুম মুখ থেকে পড়তে না পড়তেই মন্ত্রী, শাস্ত্রী, সভাসদ সক্কলে পড়ি-মরি করে ছুটে এল। সভা বসল। কী হল? ব্যাপার কী?

রাজা বললেন, 'ব্যাপার গুরুতর। বিশ্বচরাচরে সবার দাড়ি আছে, আমার নেই। একটা বাচ্চা ছেলে পর্যন্ত আমাকে শুনিয়ে দিল, আমার দাড়ি নেই।'

একজন এই ফাঁকে চট করে বলে উঠল, 'তা ঠিক। রাজামশাই ঠিকই বলেছেন। রাজার দাড়ি না-থাকাটা খুবই দুঃখের কথা। ব্যাপারটা এতদিন আমাদের খেয়াল করা উচিত ছিল। একটা তুচ্ছ ছাগলের যদি দাড়ি থাকতে পারে, তবে রাজামশায়ের দাড়ি থাকবে না। এটা ভাবা যায়!'

বুড়ো মন্ত্রী মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললেন, 'তা ঠিক। তবে ছাগল আর রাজা তো এক নয়। তবুও ছাগলের যে দাড়ি আছে এটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সত্যিই তো ছাগলের দাড়ি থাকবে আর রাজার দাড়ি থাকবে না, এ কখনো মেনে নেওয়া যায়!'

একজন সভাসদ ফুট কাটলেন, ‘এ ভগবানের অবিচার।’

আর একজন দাঁড়িয়ে উঠে হাত ছুড়লেন, ‘এ অবিচার, মানব না, মানছি না।’

অন্য আর একজন ধমকে উঠলেন, ‘মানব না, মানছি না করলেই কি সব ল্যাঠা চুকে গেল। এর একটা বিহিত করা দরকার। নইলে ছাগলই হয়তো একদিন দাড়ি উঁচিয়ে রাজার গায়ে হেঁচে দেবে।’

মন্ত্রীমশাই হঠাৎ হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘সমাধান খুঁজে পেয়েছি, খুঁজে পেয়েছি। যেখানে যত ছাগল আছে, তাদের সব দাড়ি ছাঁটাই করে দেওয়া হোক।’

রাজা বাপ্পাহুহু এবার কথা বললেন, বেশ রেগেমেগেই তিনি বললেন, ‘মুখ্যু, সব গণ্ডমুখ্যু। ছাগলের দাড়ি ছাঁটাই করলে আমার দাড়ি কেমন করে হবে? সুতরাং আমার হুকুম, যে-রাজ্যে রাজার দাড়ি নেই, সে-রাজ্যে প্রজারও দাড়ি থাকবে না। সুতরাং শুধু ছাগল নয়, মানুষেরও দাড়ি ছাঁটাই করা হোক।’

পাত্র-মিত্র, সভাসদ সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে সায় দিলেন, ‘ঠিক কথা। ছাঁটো দাড়ি।’

রাজা বাপ্পাহুহুর হুকুম শুনে মন্ত্রীমশাইয়ের তো মুখ শুকিয়ে এইটুকুনি। তিনি ফ্যালফ্যাল করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের দাড়িতে হাত দিতেই রাজা বাপ্পাহুহু চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘কাজটা শুরু হবে রাজবাড়ি থেকে। মন্ত্রীমশাইয়ের দাড়ি ফার্স্ট।’

রাজার হুকুম শুনে মন্ত্রীমশাই তো প্রায় কেঁদেই ফেললেন। তিনি আমতা-আমতা করে রাজাকে কিছু বলার আগেই রাজা হি-হি করে হেসে উঠে বললেন, ‘চালাও কাঁচি।’

যার যার দাড়ি আছে তার তার দাড়ির ওপর কাঁচি চালাবার হুকুম ছড়িয়ে পড়ল সারা রাজ্যে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাটা পড়ল কাঁচা দাড়ি, পাকা দাড়ি, চাপা দাড়ি, মাপা দাড়ি, ঝোলা দাড়ি, তোলা দাড়ি, টাটকা দাড়ি, শুকনো দাড়ি। ধরো আর কাটো।

সেই রাজ্যের একটি মানুষের দাড়িতে তখনও কিন্তু কাঁচি পড়েনি। ভদ্রলোক বহাল তবিয়তে নিজের দাড়ি নিয়ে দিব্যি এ-বাড়ি, ও-বাড়ি করে বেড়াচ্ছেন। দেখো, কোনো ভয়ডর নেই। তার দাড়ির কথাটা কানাকানি হতেই রাজবাড়ি থেকে পেয়াদা ছুটল তাকে ধরে আনার জন্যে। নিয়ে আসা

হল রাজার কাছে। হুকুম অমান্য করায় রাজা তো রেগেই ছিলেন। তাই বেশ কড়া মেজাজেই রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত সাহস হল কী করে?'

রাজার রাগ দেখেও লোকটা একটুও ঘাবড়াল না। বেশ খুশমেজাজেই জিজ্ঞেস করল, 'কীসের সাহস হুজুর?'

লোকটার ভয়ডর না দেখে রাজা তো রেগে টং। ফট করে হাত উঁচিয়ে রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মারব এক থাপ্পড়। ইয়ার্কি করার জায়গা পাওনি! দাড়ি ছাঁটা হয়নি কেন?'

সে তেমনি সহজভাবেই বলল, 'ধ্যাত! আপনি বললেই আমার সখের দাড়ি আমি কেটে ফেলব?

লোকটা ধ্যাত বলতেই বুঝতে পারছ রাজা বাপ্পাহুহুর তখন রাগ কোথায় চড়েছে। তিনি গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী, আমাকে ধ্যাত বলা? এই লোকটাকে শূলে চাপা।'

'রাজামশাই, দাঁড়ান, দাঁড়ান,' লোকটা তেমনি ঠান্ডা মেজাজেই বলল, 'দেখুন রাজামশাই, আপনি যখন ইচ্ছে আমাকে শূলে চাপাতে পারেন, যেহেতু আপনি রাজা। কিন্তু রাজামশাই বলতে পারেন, আপনার দাড়ি নেই বলে অন্যের দাড়ি কেটে আপনার কী লাভ হবে? কারণ যার দাড়ি আছে, তার কাটলেই বা কী আর না কাটলেই বা কী? কাটলে আবার টুক টুক করে গজাবে। সুতরাং আবার কাটতে হবে, আবার গজাবে। আবার কাটতে হবে, আবার গজাবে, আবার কাটতে হবে। বুঝতেই পারছেন কাটতে কাটতে মাথার ঘাম পায়ে পড়লেও, কাটা শেষ হবে না। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, যদি আপনার চাঁচাপোঁছা গালে কাঁচা কাঁচা দাড়ি গজিয়ে ওঠে। আর যদি ইচ্ছে করেন এ-কাজের ভারটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন।'

'মানে!' রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

‘মহারাজ, মানেটা আপনাকে আমি গোপনে বলতে চাই। আপনার লোকজনেরা এখান থেকে চলে গেলেই ভালো।’

রাজা বাপ্পাহুহুর ইশারায় সবাই সেখান থেকে চলে গেল।

তখন সেই লোকটা ট্যাঁক থেকে একটা গাছের শুকনো ছাল বার করে বলল, ‘মহারাজ, এর ভেতর আপনার দাড়ি আছে।’

রাজা থতমত খেয়ে গেলেন।

‘বিশ্বাস করতে পারছেন না তো?’ বলে লোকটা একটু মুচকি হাসল। তারপর রাজার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, ‘মহারাজ আমার ওপর বিশ্বাস রেখে, আপনি আজ রাতে শোবার আগে এটি গালে ফেলে ঢক ঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে নেবেন। দেখবেন কাল সকালেই ফল পেয়ে গেছেন। আর যদি ফল না পান, আপনার যা খুশি আমায় শাস্তি দেবেন। তবে মহারাজ, একটি কথা, আপনার দাড়ি যেদিন থেকে দেখা দেবে সেদিন থেকে আপনাকে হাসি ভুলতে হবে। মানে হাসলেই আপনার বিপদ।’

রাজা বাপ্পাহুহু চমকে উঠলেন, ‘কেন?’

লোকটা বলল, ‘আজ্ঞে কারণটা যদি আগে বলে দিই, তবে এই ওষুধে কাজই হবে না। সুতরাং, সে-কথাটি বলা বারণ।’ বলে লোকটা রাজা বাপ্পাহুহুর হাতে গাছের ছালটা গুঁজে দিয়ে বলল, ‘আমি কি এখন বিদায় নিতে পারি?’

রাজা বললেন, ‘ঠিক আছে, যাও। কিন্তু কাজ না হলে গর্দানটা ঠিক রেখো।’

‘জো হুকুম।’ বলে লোকটা রাজাকে সেলাম ঠুকে চলে গেল।

যা বলা তাই। রাতে শোবার সময় গাছের ছাল গিলে রাজা বাপ্পাহুহু ঘুমিয়ে পড়লেন।

একী! সত্যিই তো! সকাল বেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই তো রাজা বাপ্পাহুহুর গালে দাড়ি দেখা যাচ্ছে! ও, কী আনন্দ, কী আনন্দ! রাজা বাপ্পাহুহু বিছানা ছেড়ে তিড়িং করে লাফিয়ে পড়লেন। তারপর ঘরের মস্ত আয়নাটার সামনে সটান দাঁড়িয়ে নিজের গালের দিকে চাইলেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার করে তিনি নাচতে লাগলেন। আনন্দ আর সামলাতে না পেরে হো-হো করে হেসে উঠলেন! যাঃ। সর্বনাশ! সর্বনাশ! এ কী করলেন রাজা বাপ্পাহুহু! তাঁর যে হাসতে মানা! ব্যাস! আর দেখতে হয়, যেই হাসা অমনি তাঁর গালের নতুন দাড়ি হু-হু শব্দে বাড়তে লাগল। বাড়তে বাড়তে প্রথমে গাল থেকে গলা, গলা থেকে বুক, বুক থেকে পেট, পেট থেকে একেবারে ঠ্যাঙের নীচ অবধি নেমে এসেছে। দেখেই তো রাজা বাপ্পাহুহুর চক্ষু চড়কগাছ। কোথায় নাচ, আর কোথায় হাসি। ভয় পেয়ে তিনি চিৎকার শুরু করে দিলেন, ‘দাড়ি, দাড়ি! আমি হেসে ফেলেছি।’

যে যেখানে ছিল চিৎকার শুনে ছুটে এল। রাজার দাড়ি দেখে তো সবাই একেবারে ভ্যাবাচাকা-হাম্বা।

তাদের দেখে রাজা হাত-পা ছুড়ে চেঁচাতে লাগলেন, ‘আমি হেসে ফেলেছি। দাড়ি কেটে ফেলো।’

‘সঙ্গেসঙ্গে নাপিতভায়া হাজির। ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাঁচি চালাতেই, দাড়ি খসল।

ওমা! একী! সঙ্গেসঙ্গে যে আবার তরতর করে ঠ্যাঙের নীচ অবধি দাড়ি গজিয়ে উঠল।

রাজা চেঁচালেন, ‘এ কী হল? কাটলে না।’

নাপিতভায়া অবাক চোখে দেখতে দেখতে বলল, ‘কাটলুম তো?’

রাজা বললেন, ‘কই কাটলে? আবার কাটো!’

আবার কাটা হল। আবার গজাল।

সর্বনাশ! দেখো, এ বোধ হয় সেই হাসির ফল।

রাজা রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘কী হচ্ছে কী, আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে! আবার কাটো!’ কাটলে কী হবে, আবার সেই ঠ্যাং অবধি। অমনি রাজা

বাপ্পাহুহু হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, ‘চাই না, চাই না, আমি দাড়ি চাই না।’

আর চাই না বললে কী হবে? দাড়ি যখন একবার বেরিয়েছে আর সেই দেখে, রাজার মুখ থেকে যখন হাসি একবার গড়িয়ে পড়েছে, তখন যতই এঁ করো আর উঁ করো কিছুটি হবে না। অগত্যা রাজা বাপ্পাহুহু তাঁর সেই ঠ্যাং ঝোলা দাড়ি নিয়ে মুখখানা কোলা ব্যাঙের মতো ফোলা করে স্বর্গে যাবার দিন গুনতে লাগলেন। যেমন কথা না শুনে হ্যা-হ্যা করে হাসা! বোঝো এবার!

ছোট্ট পাখি টুনটুন

ছোট্ট পাখি টুনটুন। ছোট্ট বলে ছোট্ট, এত্তটুকু। ক-দিন হল চোখ ফুটেছে। ছোট্ট দু-টি ডানায় পালক ধরেছে। ক-দিন হল মায়ের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে খেতে শিখেছে। মস্ত একটা জামরুল গাছ। সেই গাছে টুনটুনের মা বাসা বেঁধেছে। গাছের পাতা সবুজ। সবুজ পাতার আড়ালে চুপটি করে বসে থাকত টুনটুন। পিটপিট করে দেখত, এদিকটা ওদিকটা। নয়তো সামনেটা পেছনটা। যখন খুব জোরে বাতাস বইত তখন দোল খেত টুনটুন পাতায় পাতায়। নাচত ডালে ডালে। খেলা করত একা একা। বাসা ছেড়ে বাইরে যাবার জো ছিল না। মা বারণ করেছে। মা বলেছে, 'বাইরে যেয়ো না টুনটুন। তুমি এখন ছোট্ট। বড়ো হও, তারপর যাবে।'

বয়ে গেছে টুনটুনের। একা একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে তার! আর কতদিন বসে বসে সে দেখবে ওই দূরের আকাশটা? দেখবে আকাশে আলোর ঝিলমিল? ওই আকাশের আলোয় কত পাখি! উড়ছে, ঘুরছে। কোনোটা তার মতো। আবার কোনোটা তার চেয়ে বড়ো। যতই দেখে ততই তার মনটা কেমন কেমন করে ওঠে। ভাবে, আহা রে, সে-ও যদি ওদের কাছে যেতে পারে। ওদের মতো উড়তে পারে, ঘুরতে পারে। খেলতে পারে, নাচতে পারে। দুর ছাই, কেন যে মা বারণ করে!

টুনটুন একদিন সত্যি সত্যি মায়ের বারণ শুনল না। হয়েছে কী, সকাল বেলা মা যেই খাবার খুঁজতে বেরোল, আর অমনি টুনটুন ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। খানিকটা উড়ল, খানিকটা বসল, খানিকটা নাচল। তারপর দেখতে পেল একটা মস্তবড়ো ঝিল। জল ঝিলমিল। জলের ওপর ওরা কারা ভাসছে? একটা, দুটো, পাঁচটা, ছ-টা? দেখে খুব ভালো লাগছে টুনটুনের। বা রে বা, ওইরকম সে-ও যদি জলের ওপর ভাসতে পারত! তাহলে বেশ মজা হত। ওদের সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে হল টুনটুনের। তাই ডাকল, 'ও ভাই, ও ভাই, তোমরা কারা?'

'আমরা হাঁস।' বলে পাঁচটা না ছ-টা হাঁস একসঙ্গে ডেকে উঠল, 'প্যাঁক প্যাঁক।'

ওমা, কেমন মজার ডাক প্যাঁক প্যাঁক! ফিক করে হেসে ফেলল টুনটুন। বলল, 'তোমাদের নাম শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। হাঁস আবার কী?'

সেই পাঁচটা না ছ-টা হাঁসের মধ্যে একটা হাঁস রেগে গেল। প্যাঁক প্যাঁক করে ডাক দিয়ে সে বলে উঠল, 'তোমার হাসির ছিরি দেখে আমাদেরও বিচ্ছিরি লাগছে।'

টুনটুন তখন গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'তোমারাও হাসো না! দেখি, কেমন সুচ্ছিরি লাগে! আমি উড়তে পারি। তোমরা পারো?'

একটা ছোট্টমতো হাঁস ঘাড় হেলিয়ে, মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমরা জলে জলে ভাসতে পারি। জলের ওপর নাচতে পারি।'

টুনটুন বলল, 'ও আর এমন কী শক্ত, আমিও পারি।'

'ঘেঁচু পারে। জলের তলায় তলিয়ে যাবে।' বলে সেই পাঁচটা না ছ-টা হাঁস মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। গ্রাহ্যই করল না টুনটুনকে। আর টুনটুন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সেইদিকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে কেন টুনটুন! কী যেন একটা ধপাস করে লাফিয়ে পড়ল টুনটুনের সামনে! লাফিয়ে পড়েই ডাক ছাড়ল, ঘ্যাং ঘ্যাং! এ মা, একটা ব্যাং!

ঠিক কথাই, আচমকা অমন করে হঠাৎ যদি কেউ তোমার সামনে লাফিয়ে পড়ে, প্রথমটা কে না চমকে ওঠে! কিন্তু তারপরেই ব্যাঙের মুখখানা দেখে টুনটুনের এমন হাসি পেয়ে গেল! হেসে কুটোকুটি। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার কে? এ বাবা, কী গাবদা-গাবুস দেখতে তোমাকে।'

ব্যস। আর দেখতে হয়! ব্যাং তো রেগে কাঁই। কী, একটা পুঁচকে পাখি তাকে গাবদা-গাবুস বলে! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! ব্যাংটা ঘ্যাং-

ঘ্যাং করে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই কে রে বিচ্ছু পাখি, আমাকে গাবদা-গাবুস বলিস? তোর আস্পর্ধা তো কম নয়!'

টুনটুন ব্যাঙের রাগ-রাগ মূর্তি দেখে আরও জোরে হেসে বলে ফেলল, 'উরি বাবা, রেগে গেলে তোমার গাল দুটো কী ফুলে যায়! ঠিক গাল ফোলা গোবিন্দের মতো।'

আর দেখতে! পুঁচকে পাখির মুখে এইকথা যেই শোনা, ব্যাং দিল এক লাফ! একেবারে টিপ করে টুনটুনের ঘাড়ে। টুনটুন আর একটু হলেই চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে গেছল। চোখের পলকে ফুড়ুৎ! সুড়ুৎ করে গাছের ডালে উঠে পড়ল। উঠবি তো ওঠ একটা কাঠবেড়ালির লেজের ওপর। আর দেখতে, লেজে সুড়সুড়ি লেগে গেছে কাঠবিড়ালির। সঙ্গেসঙ্গে লেজ তুলে সাঁই-ই-ই! একঝাপটা। টুনটুনি একেবারে ছিটকে-মিটকে টপাস করে গিয়ে পড়ল ওপর ডালে। ওপর ডালে শালিকের বাসা। পড়বি তো পড় বাসার ভেতর। না-জানা, না-চেনা পাখির ছানা দেখে যেই না টুনটুনকে ঠুকরে দিতে গেছে, টুনটুন সুড়ুত, সোজা মগডালে। মগডালেতে কাগের বাসা। না-জানা, না-চেনা পাখির ছানা দেখে তার নোলা দিয়ে জল গড়াল। পেটপুজো করবে বলে টুনটুনকে মারল ছোঁ! টুনটুনও পড়ি-মরি করে উড়ল ডানা ছড়িয়ে আকাশে। কাগ ফসকে গেছে। ফসকে গেলে কী হবে! কাগও উড়ল তার পেছনে।

পাখি উড়ল ডানদিকে।

কাগ উড়ল বাঁ-দিকে।

পাখির ছানা ভড়কি মারে।

কাগের বাছা চরকি মারে।

কিন্তু টুনটুন তো ছোট্ট। ও আর কতক্ষণ পারবে। প্রাণ বুঝি তার বেরিয়ে যায়। এই সর্বনাশ, জামরুল গাছের বাসাটাও তো সে আর চিনতে পারছে না! কী হবে?

তাড়া খেয়ে উড়তে উড়তে কেঁদে ফেলল টুনটুন। এখন আর কাঁদলে কী হবে। যেমন মায়ের কথা না শোনা।

না, খুব বেঁচে গেছে টুনটুন। ওই তো টুনটুনের মা। ওই তো উড়ে আসছে টুনটুনের দিকে। মা-ও যে টুনটুনকে খুঁজছিল কখন থেকে। ছেলে ঘরে নেই, মা কি নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে! হঠাৎ ছেলেকে দেখতে পেয়েছে মা। দেখতে পেল, একটা কাগ তাড়া করেছে টুনটুনকে। এই

ধরল! এই বুঝি গালে পুরল! টুনটুনের মা চোখের নিমেষে মারল ছোঁ। আলতো করে নিজের ঠোঁটে টুনটুনকে চেপে ধরে একেবারে তির বেগে হাওয়া। কাগ তো হাঁ। ফ্যালফেলিয়ে দেখতে দেখতে নিজের বাসায় ফিরে গেল।

আর, টুনটুনের মা-ও ঢুকে পড়ল নিজের বাসায়। ছেলে তখন ভয়ে কাঁপছে। মা-ও হাঁপাচ্ছে। মা তাড়াতাড়ি ছেলেকে পালকের কোলে জড়িয়ে ধরল। পালকের কোলে ঃআ কী আরাম!

এখন যেন একটু কাঁপুনি থেমেছে টুনটুনের। ভাবছে, ভাগ্যিস মা ছিল। বটেই তো, মায়ের কথা শুনলে এমন বিপদ কি হত? মায়ের পালকঢাকা বুকের নীচে বসে বসে এখন টুনটুনের মনে হচ্ছে, আঃ, মা কী মিষ্টি। না, আর কোনোদিন মায়ের কথা না শুনে কোথাও যাবে না টুনটুন। কক্ষনো না।

বুক্কুটা একদম বোক্কা।

বোক্কা কেন?

না, না, বোক্কা বলাটা তোমার একদম ঠিক নয়। সব্বাই জানে সে একটা বানর। শুধু বানর নয়, একটা বাচ্চা বানর। এই সেদিন পর্যন্ত সে হয় মায়ের কোলে চড়ে, না হয় মায়ের পিঠে বসে টুকটুক করে একটু বড়ো হয়েছে। এখন সে, হু-ই-ই ওখান থেকে, হে-ই-ই এখান পর্যন্ত লাফ দিতে পারে! এখন আর সে মায়ের পিঠেও বসে না, কোলেও ওঠে না।

তবু কেন তাকে বোক্কা বলবে?

বলবই তো! বোক্কাটা করবে কী এট্টা-ওট্টা জুলজুল করে দেখবে। আর মায়ের মুখের দিকে পিটপিট করে তাকাবে! আসলে কোনটার নাম ফড়িং আর কোনটার নাম শুঁয়োপোকা সে জানে না তো, তাই! মা বলে দিলে, তবে, মায়ের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ফড়িং নয়তো শুঁয়োর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাবে।

এ তো সবাই করে! কে আর সব জেনেচিনে জন্মায় বলো! পৃথিবীর আলোয় প্রথম চোখ মেললে তবে না তুমি দেখবে। তবে না তুমি দেখতে দেখতে সব জানবে, চিনবে!

সেদিন একটা ভারি মজা হয়েছে। হয়েছে কী, অশত্থ গাছের ডালে একটা টিয়া পাখি এসে বসেছে। বসেছিস বেশ করেছিস, বোস! কে বারণ করেছে! আর কাকে বলে দাঁত খিঁচুনি, শিখে ফেলবে সব।

ঠিক আছে। সে যখন শিখবে, তখন শিখবে। এখন কিন্তু তার টিয়া পাখিটাকে দেখে খুব ভালো লেগে গেল। ওটা যে পাখি, পাখি যে ডানা মেলে আকাশে উড়তে পারে, সেটা বুক্কু ক-দিন আগেই মায়ের কাছে শুনে নিয়েছে। কিন্তু এখন গাছের ডালে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে যে-পাখিটা সে-পাখিটার যে কী নাম, সেটা তার জানা নেই। তাই বুক্কু তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মাগো, মাগো, ওই পাখিটার নাম কী মা?'

মা বলল, 'ওটার নাম সবুজ টিয়া।'

বুক্কু বোক্কার মতো জিজ্ঞেস করে বসল, 'সবুজ কী মা?'

মা বলল, 'গায়ের রং।'

বুক্কু মায়ের মুখের দিকে হাঁদার মতো তাকিয়ে বলে বসল, 'ওর গায়ের রং সবুজ, আমার তবে এমন কেন?'

মা উত্তর দিল, 'ভগবান যাকে যেমন করেন।'

'ভগবান কে মা?'

মা এবার ফ্যাসাদে পড়ল। কিছু ভেবে না পেয়ে উত্তর দিল, 'তাকে কোনোদিন দেখিনি বাপু। অন্য কেউ দেখেছে কি না তাও জানি না। সবাই বলে, তাই বললুম।'

ফট করে বুক্কু বলে বসল, 'ভগবানের ক-টা চোখ মা?'

মা বলল, 'কেন চোখের কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

বুক্কু উত্তর দিল, 'না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। আসলে কী জানো মা, আমি যতই দেখছি, ততই আমার মজা লাগছে। ওই টিয়া পাখিটার গায়ের রং যেমন সবুজ, তেমনি তার আবার দুটো পা। অথচ আমাদের হাত-পা মিলিয়ে চার-চারটে। পাখিটা ঠোঁট দিয়ে পোকা ধরে খায়, আমরা হাত দিয়ে কলা ছিঁড়ে খাই। ওরা আকাশে ওড়ে, আমরা গাছে গাছে লাফাই। আমাদের ঝোলা লেজ, ওদের লেজই নেই। চোখ আমাদের অবশ্য দুটো দুটো। কে জানে ভগবানকে আমাদের মতো দেখতে, না ওই পাখিদের মতো! না কি ভগবান অন্যরকম দেখতে, তার চোখ একটা না ক-টা কে জানে! সেই জন্যেই চোখের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

যাক গে যাক, বুক্কুর এত কথার একটা কথারও উত্তর দিতে পারল না মা। কেননা, ঠিক এই সময়ে বনের ভেতর দিয়ে একদল শুয়োর খাবার খুঁজতে বেরিয়েছিল। বুক্কু জিজ্ঞেস করল, 'মা ওরা কারা?'

মা বলল, 'শুয়োর।'

বুক্কু জিজ্ঞেস করল, 'ওদের সঙ্গে একটু খেলা করব মা?'

মা নাক সিঁটিয়ে বলল, 'ছিঃ, ওদের সঙ্গে খেলে না।'

'কেন মা?'

'ওরা পচা পাঁকে মুখ ডুবিয়ে কেঁচো খায়!'

বুক্কু জিজ্ঞেস করল, 'আমরা বুঝি কেঁচো খাই না?'

মা এবার রাগ করল। ধমক দিয়ে বলল, 'তুই একটা গাধা।' বলতে বলতে মা সত্যি সত্যি একটা গাধার দিকে ইশারা করে ছেলেকে দেখাল। বলল, 'ওই দেখ, ইদিকে একটা গাধা আসছে। মরবে। বাঘে দেখতে পেলেই ঘাড় মটকাবে। তুই কোথাও নড়িস না। এখানে চুপচাপ বসে থাক। আমি দেখি, খুঁজেপেতে খাবার নিয়ে আসি।' বলে, বুক্কুর মা এগাছ থেকে লাফ দিতে দিতে অন্য গাছে হারিয়ে গেল।

এদিকে, গাধাটা একেবারে বুক্কুর চোখের সামনে পৌঁছে গেল। বুক্কু গাছের ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে, আর ভাবছে, ডাকবে, কি ডাকবে না। শেষমেষ সে ডেকেই দিল, 'এই গাধা!'

যেই ডেকেছে, গাধাটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এদিক-ওদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখছে। ভাবছে, কে ডাকল! যখন কাউকে দেখতে পেল না, তখন সে আবার হাঁটল।

বুক্কু আবার ডাক দিল, 'যাচ্ছিস কোথায়? আমি এই যে গাছের ওপর।'

গাধা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছের ওপর দিকে তাকাল। বুক্কুকে দেখতে পেল। তারপর বলল, 'ও তুই, বাঁদর!'

'না, আমার নাম বুক্কু। আমি বানর।' উত্তর দিল বুক্কু!

গাধা খেপে গেল। বলল, 'তুই তো আচ্ছা ডেঁপো!'

বুক্কু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'তুমি আবার ভুল বললে, আমি ডেঁপো নই। আমি বুক্কু। আমি বানর।'

'ফাজলামি করার জায়গা পাসনি,' এবার গাধাটা খিঁকিয়ে উঠল, 'তুই আমাকে বানর আর বাঁদরের তফাত শেখাচ্ছিস! জানিস আমি ইনফ্যান্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। জানিস লোকে আমায় বিদ্বান বলে।'

বুক্কুটা ভীষণ ঘাবড়ে গেল গাধার ধাতানি খেয়ে। ভয়ে ভয়ে বলে ফেলল, 'তবে যে মা আমায় গাধা বলে গাল পাড়ল!'

বুক্কুর কথা শুনে গাধাটা রেগে টং। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'তোর মা একটা কপিনি,' বলে গাধাটা আর কথা বাড়াল না। কেটে পড়ল।

বুক্কু ভাবতে বসল, তাই তো 'কপিনি' আবার কেমন গালি!

তা সে যাই হোক, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ একটা হরিণ সেই গাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিল। সে কচি ঘাস খুঁজছে। খিদে পেয়েছে। কী সুন্দর দেখতে হরিণটাকে। গাছের শাখা-প্রশাখার মতো মাথায় শিং। হলুদ গায়ে ফুল ফুল ছাপ। টানা টানা চোখ। তার দিকে চোখ পড়তেই বুক্কু একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে থাকতে পারল না। এই প্রথম সে হরিণ দেখছে। তা-ই অনেকটা খুশি খুশি গলায় গাছের ওপর থেকে ডাক দিল, 'তুমি কে গো? কী সুন্দর দেখতে তোমায়!'

সুন্দর বলতেই, হরিণের গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ে না। একডাকেই তার গাছের ওপর চোখ চলে গেছে। বুক্কুকে দেখে বেশ দেমাকি গলায় উত্তর দিল, 'কেন, তুই আমায় চিনিস না?'

বুক্কু বলল, 'আমি তো সবে একটু বড়ো হয়েছি, তাই একটু একটু করে সবাইকে চিনছি।'

বুক্কুর কথা শুনে হরিণটা ঠোঁট উলটে বলল, 'ধুস, তুই একটা আস্ত বোকা। আমায় বনের সবাই চেনে। তোর মা-ও চেনে। আমার নাম হরিণ! তোর মা তোকে এখনও বলেনি আমার কথা?'

'মা না-ই বলুক! আমি তো তোমার নিজের মুখেই শুনলুম তোমার নাম। আমার খুব ভালো লাগল। আমার বড্ড ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে খেলা করি! তুমি গাছে উঠতে পারো?'

'কেন? গাছে ওঠার কথা বলছিস কেন?'

'তুমি গাছে উঠলে, আমরা দু-জনে গাছে বসে বসে খেলা করতুম।'

বুক্কুর কথায় হরিণ হাসবে, না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারল না। উলটে বলল কী, 'তোর বানর হয়ে জন্মাবার কথা ছিল, তুই বানর হয়েই জন্মেছিস! ওরে বুদ্ধু, তোর সাধ তো কম নয়! তুই বানর হয়ে হরিণের সঙ্গে খেলা করতে চাস! তা-ও আবার গাছের ওপর বসে! তোর বুদ্ধির কপাট খুলতে এখনও অনেক দেরি আছে। ওরে বানর, হরিণ কখনো গাছে

চড়ে না। সে মাটিতে পা ফেলে হাঁটে, না হয় ছোটে। সে যখন ছোটে, তখন বাঘও হেরে ভূত হয়ে যায়, জানিস!'

এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে।

কী হয়েছে?

একটা বাঘ তো এতক্ষণ ওত পেতে বসেছিল! এবার হরিণটাকে শিকার করবে বলে, চোখে টিপ পাকিয়ে নিঃসাড়ে বেরিয়ে আসছে! আর পড়বি তো পড় বুক্কুর চোখে পড়ে গেছে! রক্ষে এই, বাঘের চেহারাটা আগেই মা তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। তা-ই, যেই না বাঘকে দেখা, অমনি সে হরিণটাকে চিৎকার করে সাবধান করল, 'এই হরিণ, তোর পেছনে বাঘ!'

আর যাবে কোথায়! অমনি সঙ্গেসঙ্গে হরিণ দিয়েছে ছুট! আর বাঘটাও মেরেছে লাফ!

একবার হরিণটা সামনে ছুটতে ছুটতে পেছনে প্যাঁচ খায়, তো বাঘটাও ধরতে ধরতে ফসকে যায়!

এমনই এক বার, দু-বার, তিন বার করার পর যেই চার বারের বার বাঘটা হরিণটাকে প্রায় ধরে ফেলে, তখন বুক্কু করল কী, গাছের ওপর থেকে মারল লাফ, একেবারে বাঘের পিঠে। বাঘের পিঠে পড়েই বুক্কু খামচে ধরল বাঘের পেটটা। তারপর এমন কাতুকুতু দিতে লাগল বাঘের পেটে যে, বাঘ হরিণ ধরবে কী, হাসতে হাসতেই বুঝি তার দম ফেটে পড়ে! হরিণ তো তখন ভোঁকাট্টা! বাঘের তো সে যাত্রায় হরিণ ধরা হলই না, উলটে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আর সেই তক্কে বুক্কুটা তিড়িং! লাফিয়ে একেবারে ডালে!

বাঘের হাসি থামল। রেগে কটমট করে গাছের ওপর দিকে তাকাল বাঘ। বুক্কু সেই চোখ দেখে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু বাঘের ভয়ে বুক্কু গাছের এত ওপরে উঠে গেছে, বাঘের সাধ্যি কী তাকে ধরে। অগত্যা বাঘ রাগে গরগর করতে করতে সেখান থেকে অন্য পথে চলতে শুরু করল। যাক বাবা বাঁচা গেল!

ক-দিন পরে হল কী, সেই হরিণটা বুক্কুদের সেই গাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিল। বুক্কু দেখতে পেয়েছে! চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে, এই যে, হরিণ, তুমি আবার এপথ দিয়ে কোথা যাচ্ছ?'

হরিণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে, গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই এইখানে? তোকেই তো আমি খুঁজছি। তোর নাম কী রে?'

‘বুক্কু।’

‘বাহ! তোর নামটা তো বেশ!’

বুক্কু বলল, ‘তোমার নামটা আরও ভালো, হরিণ।’

হরিণ উত্তর দিল, ‘বুক্কু আয়, আজ থেকে তুই আমার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে খেলা করব। তুই সেদিন না থাকলে আমার কী দশা হত বল! আসলে কী জানিস, আমি ভাবতুম আমি হরিণ, আমি বানরের চেয়ে জাতে বড়ো। কিন্তু তুই একটা ছোট্ট বানর ছানা! আমার চোখ খুলে দিলি। আমি বুঝতে পারলুম বন্ধুর কোনো জাত নেই।’

টুং-এর বন্ধু ঝুমঝুমি

টুং। একটি ছেলের নাম। কেউ যখন ডাকে ওর নাম ধরে, মনে হয় কে যেন টোকা মারল জলতরঙ্গে। বেজে উঠল টুং। ভারি মিষ্টি।

ভারি মিষ্টি ছেলেটি। ছোট্ট। ডাগর ডাগর দু-টি চোখ। খুশির মতো আলো ছড়িয়ে রয়েছে চোখ দু-টিতে। চোখ দু-টি মেলে থাকে টুং ওইদিকে। ওই যেদিকে বনটা শুরু হয়েছে।

ছোট্ট ঘরটি তাদের। মাটির। বনের ধারে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন আঁকা ছবি। সত্যি! ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি। টুং এঁকেছে। রং-ঝিলমিল ফুল। লাল টুকটুক পাখি। রুপা ঝুরঝুর মাছ। বাবা কিচ্ছু বলে না টুংকে। ও যত পারে আঁকে। আঁকে আর মোছে। যখন পারে না টুং, বাবা এঁকে দেয়।

না, টুং-এর কেউ নেই বাবা ছাড়া। বাবা মাটির কাজ করে। মাটির কলসি গড়ে। হাঁড়ি, গেলাসে নকশা কাটে। আলপনা দেয়। তারপর নৌকো চেপে হাটে যায়। সেখানে বেচে আসে। বাবা বলেছে, আর একটু বড়ো হলে টুংও যাবে। টুং যাবে হাটে। বাবার সঙ্গে। হাঁকতে হাঁকতে ফিরি করবে, 'হাঁড়ি চাই, কুঁজো চাই। কলসি নে-বে।'

রোজ সন্ধে বেলা বাবা যখন হাট থেকে ফিরবে, জিলিপি কিনে আনবে টুং-এর জন্যে। একদিন জিলিপি। কোনোদিন জিবেগজা। আর একদিন সিঁড়ির নাড়ু। ঘরে ফিরে ঢোলক বাজাবে বাবা। গান গাইবে।

টুংও ঢোলক বাজাতে পারে। বাবা যখন থাকে না ঘরে, টুং গলায় ঢোলক ঝুলিয়ে বাজায় আর গান গায়।

খুব সকাল সকাল উঠবে টুং। খুব সকাল। তখন একটু একটু আলো ফুটবে। একটু একটু সোনালি আলো গাছের পাতায় ছড়িয়ে পড়বে। একটি একটি পাখি ডাকবে। তখন ও ছুটবে। ঘর থেকে বাইরে। ছুটতে ছুটতে নদীর জলে লাফিয়ে পড়বে। নদীর জল নেচে উঠবে। সাঁতার কাটবে। দুলবে। দুলতে দুলতে ইচ্ছে হয় নদীর ওপারে চলে যায় টুং। নদীর ওপারে, বনটা যেখানে খুব গভীর। কেউ যায় না ওদিকে। বাবা বলে, ওদিকে নাকি একটা দত্যি আছে! ভারি শয়তান! সে নাকি এক রাজকন্যাকে চুরি করে এনে বন্দি করে রেখেছে ওই বনে।

মাঝে মাঝে মনে হয় ওই গভীর বনে লড়াই করে আসে টুং শয়তানটার সঙ্গে।

ধ্যাত! ভয় না আর কিছু! বনে ঢুকতে একটুও ভয় করে না ওর। বাঘ না ঘেঁচু। ভালুক না ছাই। এক-এক দিন ও যখন শুকনো পাতা কুড়োতে যায় বনে, ডাল ভেঙে আনে গাছের, তখন ভয় করে ওর? মোটেই না। তখন বাঁদরগুলো ওকে দেখে কেমন হুটোপাটি লাগিয়ে দেয় গাছে! ডালে ডালে। টুং তখন মজা করে চেঁচাবে, 'এই বাঁদর, কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?' বাঁদরগুলো কিঁচকিঁচ করে ডাকবে ওর কথা শুনে। লাফাবে কেমন!

একবার ছবি এঁকেছিল টুং কাগজে। একটা পাখির ছবি। ছবির নীচে লিখেছিল:

'দত্যির হাতে বন্দিনি রাজকন্যার জন্য আমার উপহার।

ইতি-তার অচেনা ভাই টুং।'

তারপর একটা বাঁদরকে 'আয় আয়' বলে ডেকেছিল টুং। তাকে সত্যি সত্যি একছড়া কলা দিয়েছিল। হ্যাঁ, সেই ছবির কাগজটা একটা সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল বাঁদরের গলায়। বলেছিল, 'বন্দিনি রাজকন্যাকে পৌঁছে দিবি।'

কী বুঝল কে জানে। হাতে কলা নিয়ে বাঁদরটা মারল লাফ। একবারে গাছের ওপর। ছবিটা দুলছে গলায়। তারপর গাছে গাছে লাফাতে লাফাতে কোথায় যে চলে গেল জানে না টুং। দেখতেই পেল না আর।

না, আর কোনোদিনই দেখতে পায়নি টুং সেই বাঁদরটাকে। কতদিন খুঁজেছে। হয়তো বাঁদরটা সত্যি সত্যি চলে গেছে সেই রাজকন্যার কাছে। এখন হয়তো বন্দিনি রাজকন্যা টুং-এর আঁকা ছবি দেখছে। হয়তো কাঁদছে। ভাবছে, কে অচেনা ভাইটি তার!

বাঘ অবিশ্যি টুং কোনোদিন দেখেনি। বাঘের ডাক শুনেছে। দেখলেই বা কী! বাঘকে মোটেই ভয় পায় না টুং। কতদিন তো ও বাঘ খুঁজেছে ওই বনে। তির-ধনুক নিয়ে। অবিশ্যি বনের অনেক ভেতরে তো আর যাওয়া যায় না। কেউ-ই যেতে পারে না। তবু মাঝে মাঝে ওর যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে, বনের গাছের সঙ্গে গাছ হয়ে, ফুলের সঙ্গে ফুল হয়ে, বাঘের সঙ্গে বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তা তো হবার জো নেই!

আজ মেঘ করেছে।

তখনও পর্যন্ত জানত না টুং আজ মেঘ করবে। কেমন করে জানবে? বাবা তো কোন সকালে হাটে বেরিয়েছে। আকাশ তখন রোদ ঝিলমিল। এখন কালো ঘুরঘুট্টি। মেঘ করলে টুং-এর মনটা কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। জানলায় মুখটি বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টুং। চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে বাইরেটা। আকাশটা। আর দেখে গাছে গাছে, সবুজে সবুজে ঢাকা বনটা। মেঘ যায় কোথা ওই নীল আকাশের গা বেয়ে? ভাবে টুং।

টুপ টুপ! বিষ্টি নামল। মুখখানি খুশিতে উছলে গেল টুং-এর। ছুট্টে বাইরে বেরিয়ে গেল। চেঁচিয়ে ডাকল, 'আয় বিষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।'

দেখতে দেখতে ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নেমে এল। ছুট দিলে টুং। ছুটছে ও। জলে ভিজছে। ছুটবে ও যেদিকে পা দু-টি যায়। গাছের পাতায় পাতায় নাচছে বিষ্টির ফোঁটারা। মাটিতে নাচছে ওর পা দু-টি। ও আজ থামবে না। মানবে না। চলে যাবে টুং বন্দিনি রাজকন্যার কাছে ছুটতে ছুটতে। ওই বনের মধ্যে।

বনেই ঢুকল টুং। একেবারে ভিজে নেয়ে গেছে। বনের গাছে গাছে, সবুজ পাতার নীচে নীচে ও আনন্দে নেচে উঠল। গুড় গুড় মেঘ ডাকল, ও থামল না। কড় কড় কড় বাজ পড়ল, ও শুনল। ও ছুটল। যেন হরিণ। ছোটে আর বনের সবুজে লুকিয়ে পড়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে টুং। এদিক ওদিক। দেখে গাছ আর গাছ। শুধু গাছ। কই, ডালে ডালে আজ একটিও তো বাঁদর নেই! একটিও তো পাখি দেখতে পাচ্ছে না টুং। কাঠবেড়ালিরা তো ছুটছে না তুড়ুক তুড়ুক, এ-ডাল ও-ডাল। সব্বাই আজ লুকিয়ে পড়েছে। বাব্বা! বিষ্টিকে এত ভয়!

ভয় নেই টুং-এর একটুও। ও শুধু আজ একা। একা ঘরের বাইরে। ও তাই হাসবে। গাইবে। ডাকবে।

টুং সত্যি সত্যি ডাকল। ডাকল গাছের দিকে চেয়ে, 'ও পাখি, ও পাখি, কোথা তোমরা?'

কোনো সাড়া পেল না।

চেঁচাল, 'কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি, বিষ্টিতে এত ভয়!'

সব চুপচাপ।

না, না, চুপ তো নয়! কী যেন একটা কুঁৎ কুঁৎ করে ডাকছে!

ছুটতে ছুটতে থামল টুং। থমকে চাইল। কীসের শব্দ! কে ডাকে? খুঁজল। বুনোগাছের ঝোপঝাড় হাত দিয়ে সরিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ চমকে ওঠে টুং।

ওমা! ওমা! ওটা কী?

ছুট্টে এগিয়ে গেল টুং।

আরে। এ যে একটা ভালুকছানা! জলে-কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ। মা কোথা ওর?

টুং ভালুকছানার গায়ে হাত বুলাল। আহা-রে! কাঁপছে। কোলে তুলে নিল টুং। ছোট্ট তো! একদম কষ্ট হল না। চোখের দিকে চাইল টুং। চোখ দুটো কেমন পিটপিট করছে ছানার। মাথায় হাত দিল। গায়ে কাদা লেগেছে, ফেলে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোর মা কোথা?'

ভালুকছানা কি টুং-এর কথা বুঝতে পারে? কী বুঝবে? কাঁপছে। কুঁৎ কুঁৎ কুঁৎ ডাকছে। জুলুক জুলুক চাইছে।

বুঝতে আর বাকি রইল না টুং-এর। মা পালিয়েছে। ঠিক পালিয়েছে। বিষ্টি দেখে ছেলেকে ফেলে পালিয়েছে। ইস! দয়ামায়া নেই মায়ের! মা বুঝি আবার এমনি হয়? এমনি নিষ্ঠুর?

তবু ডাকল টুং, 'ও ভালুক-মা, ও ভালুক-মা, তোমার ছেলে কাঁদছে।'

বয়েই গেছে। কে সাড়া দেবে? ভালুক-মা কাছেপিঠে থাকলে তবে তো! যা বিষ্টি!

তবু এধার-ওধার একটু খুঁজল টুং।

পেল না দেখতে। ভাবল, জলের মধ্যে, বনবাদাড়ে বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো। ছানাটার অসুখ করলে! এখন ওকে নিয়ে ঘরে যাই। পরে ওর মাকে খুঁজে বার করব। ভালুকছানাকে কোলে নিয়ে ছুট দিল টুং। ঘরের দিকে।

ঘরে যখন পৌঁছোল তখনও বিষ্টি পড়ছে। কমে এসেছে অবিশ্যি। তখনও বাবা আসেনি। ভালুকছানার গাটা ও চটপট মুছে দিল। শুকনো শুকনো পাতা বিছিয়ে বিছানা করল। ছানাকে শুইয়ে দিল। ছানার গায়ে বেশ করে একটা কাপড় চাপা দিল। মাথার গোড়ায় বসল টুং। হাত বুলিয়ে দিল গায়ে-মাথায়। ঘুমিয়ে পড়ল ভালুকছানা। ঘুমুবে না? বাব্বা! কী কষ্ট! ওইটুকু তো প্রাণ! কতক্ষণ কষ্ট সইবে?

পরেরদিন ভালুকছানা চুক-চুক-চুক দুধ খেল। টুং-এর দিকে চেয়ে চেয়ে ফিক-ফিক-ফিক হাসল।

'দুষ্টু!' টুং গালটা টিপে দিল ভালুকছানার। ভালুকছানা শুয়ে পড়ল মাটিতে। গড়াগড়ি লাগিয়ে দিল। টুং হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। নেচে উঠল। বলল, 'চ, তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসি।'

টুং ভালুকছানাকে নিয়ে বনে ছুটল।

টুং বনে বনে ডাকল।

বনে বনে ছুটল।

বনে বনে হাঁটল।

দেখতেই পেল না ভালুকছানার মাকে।

ফিরে এল টুং। আর যায়নি কোনোদিন। গিয়ে কী হবে? যার ছেলে তারই মাথাব্যথা নেই! মনটা খারাপ হয়ে গেল টুং-এর।

তাই একদিন টুং বলল, 'ভালুকছানা, ভালুকছানা, আমার সঙ্গে হাঁটবি?' বলে টুং হাঁটল।

টুং হাঁটল, টুক টুক, টুক টুক।

ভালুকছানা টুং-এর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল, থুপ থুপ, থুপ থুপ।

আর একদিন টুং বলল, 'ভালুকছানা, ভালুকছানা, আমার সঙ্গে ছুটবি?' বলে টুং ছুটল।

টুং ছুটল, পাঁই পাঁই, সাঁই সাঁই।

ভালুকছানা টুং-এর দিকে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে ছুটতে লাগল, থপ থপ, থপ থপ।

টুংও ছোটে, ভালুকও ছোটে।

ছুটতে ছুটতে একেবারে নদীর সামনে। টুং লাফিয়ে পড়ল নদীর জলে।

নদী-নদী জল দেখে থমকে দাঁড়াল ভালুকছানা। দাঁড়িয়ে রইল ডাঙায় চুপটি করে। দেখতে লাগল। দেখতে লাগল নদীর জলে দোল খাচ্ছে টুং। ভারি মজা।

সেইবার নদীতে গেল ভালুকছানা টুং-এর সঙ্গে।

একবার শহরে গেল ভালুকছানা টুং-এর পিঠে।

হাটবার, হাটে গেল ভালুকছানা টুং-এর পিছে।

টুং-এর বন্ধু হয়ে গেল ভালুকছানা।

টুং খাবে, ভালুক চাইবে।

টুং ঘুমোবে, ছানা গড়াবে।

টুং হাসবে, ছানা নাচবে।

তাই একদিন টুং ঘরের দেওয়ালে ছবি আঁকতে বসল।

কী আঁকছে? কী আঁকছে?

ভালুক-ভালুকছানা আঁকছে।

ভালুকছানার ছবি আঁকছে টুং, আর ছানা-ছানা ভালুকটা বসে বসে দেখছে।

আঁকতে আঁকতে ছবি আঁকা শেষ হল টুং-এর। কিন্তু দেখতে দেখতে দেখা আর শেষ হল না ভালুকছানার। সে দেখছে আর দেখছে।

তাই টুং ডাকল, 'ভালুকছানা, আয়, আয়, খেলি আয়।'

ভালুকছানা ছবি-ছবি রং দেখছে। গেল না।

টুং বলল, 'ভালুকছানা, আয়, আয়, খাবি আয়।'

ভালুকছানা ছানা-ছানা ছবি দেখছে। উঠল না।

টুং বলল, 'ভালুকছানা, আয়, আয়, শুবি আয়।'

ভালুকছানা ভালুক-ভালুক আঁক দেখছে। নড়ল না।

তখন টুং ঘরে গেল। ঢোলক নিল। গলায় দিল। টাক-ডুম-ডুম বোল বাজাল। গান ধরল।

ছানা তখন তড়বড়িয়ে উঠে পড়ল। তার ছবি দেখা শেষ হল। নড়বড়িয়ে ঘরে ছুটল। ওমা! ওমা! নাচ ধরল। ঢোলক বাজে টাক-ডুম, টাক-ডুম। ভালুক নাচে ঝুমঝুম, ঝুমঝুম।

খিলখিল করে হেসে উঠল টুং। জড়িয়ে ধরল ভালুকছানাকে। নাচতে নাচতে গড়িয়ে পড়ল ভালুকছানা মাটিতে। হাসতে হাসতে ওর গালে একটা চুমু খেল টুং। ছুট্টে গিয়ে ভালুকছানার ছবির নীচে লিখে দিল:

আমার বন্ধু ঝুমঝুমি

ইতি

টুং

তারপর ভালুকছানার গলা জড়িয়ে বলল, 'আজ থেকে তোর নাম ঝুমঝুমি! চ, খাবি চ।'

এদিকে ভালুকছানার মা একদিন খুঁজছে ছানাকে। পায়নি। দু-দিন খুঁজছে ছানাকে। পায়নি।

ক-দিন পরে ভালুক-মা ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে নদীর ঘাটে এল। তখন খুব রাত্তির। নদীর জলে চিকচিকে মাছেরা ঝিলমিল নাচছে। ছানাপোনারা খেলছে। দুল-দুল দুলছে। ভালুক-মা সেইদিকে চেয়ে রইল। চেয়ে চেয়ে নিজের মনে কাঁদতে লাগল।

চিকচিক মাছেরা ঠিক দেখতে পেয়েছে ভালুক-মাকে। ছানা-ছানা পোনাটা টুপ করে মুখটি তুলল। বলল, 'ভালুক-মা, ভালুক-মা, ঘাপটি মেরে বসে কেন? আমাদের ধরবার মতলব! খাবে বুঝি? তা আর হচ্ছে না।' বলে, ছানা-ছানা পোনাটা জলের তলায় আবার টুপ করে ডুব মারল। আর সব মাছেদের খিলখিল করে কী হাসি!

কথা শুনে ভালুক-মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

চিকচিক মাছেরা হাসতে হাসতে থামল। বলল, 'ও ভালুক-মা, ও ভালুক-মা, কাঁদছ কেন গো?'

ভালুক-মা বলল 'মাছ-চিকচিক, মাছ-চিকচিক, আমি তোদের খেতে আসিনি। আমার ছেলেকে খুঁজতে এসেছি।'

'খুঁজছ কেন?'

'আমার ছেলে যে হারিয়ে গেছে!'

'কে বলল, হারিয়ে গেছে? হারায়নি তো!'

ভালুক-মা বসেছিল। ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘাড় বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তবে? তবে?'

'কেন, সে তো আছে টুং-এর কাছে।'

ভালুক-মার মনটা নেচে উঠল। ছটফটিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে? কে? সে কে? সে কে?'

'ওমা! টুংকে চেন না? টুং গো টুং। সে সাঁতার কাটে জলে। কাঠ কাটে বনে।ঢোলক বাজায় টাক-ডুম-ডুম। ছবি আঁকে গাছ মাছ ফুল।'

ভালুক-মা জিজ্ঞেস করল, 'মাছরে মাছ, ঝুন-ঝুন-ঝুন, কোথায় থাকে টুং?'

'আমরা কেমন করে জানব? আমরা থাকি জলে। সে থাকে ডাঙায়। গেছি কোনোদিন তার বাড়িতে? খুঁজে নাও না।'

ভালুক-মা মাছের কথা শুনে তক্ষুনি ছুটল টুং-এর বাড়ি খুঁজতে। ছুটল সেই রাত্তিরে। অন্ধকারে।

টুং-এর ঘর একটু দূরে নদীর ঘাট পেরিয়ে। একটু বাঁয়ে নদীর ঘাট ছাড়িয়ে।

ভালুক-মা একটু একটু হাঁটে। একটু একটু ছোটে। এক-পা এক-পা থামে। এদিক ওদিক দেখে।

দেখতে দেখতে সামনে একটা ঘর পড়ল। ঘরের দাওয়ায় একটা ছাগল ঘুম দিচ্ছে।

ভালুক-মা ডাক দিল, 'ও ছাগল, ও ছাগল, এটা কি টুং-এর বাড়ি?'

ভালুকের ডাক শুনে ছাগলের ঘুম তো গেছে ভেঙে! চেয়েই চক্ষু ছানাবড়া! তিড়িং করে মারল এক লাফ! মেরেই ছুট। ছুটল আর চেঁচাল, 'ম্যা-এ্যা-এ্যা-এ্যা।'

ভালুক-মা তো হতভম্ব! বলল, 'যাঃ বাব্বা! ছাগল না তো, পাগল।'

ভালুক-মা আবার হাঁটল।

হাঁটতে হাঁটতে আর একটা ঘর দেখল। এগিয়ে গেল ভালুকমা ঘরের দিকে। দেখল কী, ঘরের সামনে একটা গাধা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে।

ভালুক-মা হাঁক দিল, 'ও গাধা, ও গাধা, এটা কি টুং-এর বাড়ি?'

গাধার কোথায় ঢুলুনি আর কোথায় কী! ভালুক দেখে চার পা তুলে মারল লাফ। বাপরে বাপ! বিকট হেঁকে ডাক পাড়ল, 'ঘ্যাংকু, ঘ্যাংকু।' তারপর দে ছুট। দে ছুট।

ভালুক-মা তো ভ্যাবাচ্যাকা। বলল, 'যাঃ চলে! গাধা নয় তো, খেঁদা!'

ভালুক-মা আবার হাঁটা দিল।

আর একটা ঘর। একটা হাঁস। বসে আছে। ডিমে তা দিচ্ছে। চুপচাপ।

ভালুক-মা ডাকল, 'ও হাঁস-মা, হাঁস-মা, এটা কি টুং-এর বাড়ি?'

আর দেখতে হয়! ভালুক দেখে হাঁস-মায়ের পিলে শুকিয়ে গেল। ডিম ছেড়ে মার ছুট। ছুটতে ছুটতে হাঁক পাড়ল, 'প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক।'

ভালুক-মা বলল, 'দূর তোর! হাঁস নয় তো, হাঁদা!' বলে আবার পা ফেলল।

হাঁটতে হাঁটতে এবার থমকে দাঁড়ায় ভালুক-মা।

কেন?

চমকে চায়।

কেন? কেন? কী দেখল?

পাগল-পাগল ছাগলটা?

না, না।

খেঁদা-খেঁদা গাধাটা?

না, না।

হাঁদা-হাঁদা হাঁসটা?

না, না।

তবে?

দেখলে কী, একটা ছোট্ট ঘর।

দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি।

ফুল ফুল ফুল।

মাছ মাছ মাছ।

পাখি পাখি পাখি।

আর?

ওমা! ওটা কী? ওটা কী ছবি?

একটা ভালুকছানার ছবি।

ভালুক-মা ভালো করে দেখল ছবির দিকে। তাই তো! তাই তো! ভালুকছানার ছবিই তো! কী যেন লেখা আছে ছবির নীচে! দেখতে পেল না ভালুক-মা দূর থেকে। এগিয়ে গেল কাছে। হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট দেখতে পেল ভালুকমা। ছবির নীচে লেখা:

আমার বন্ধু ঝুমঝুমি

ইতি

টুং

আর দেখতে হয়! ভালুক-মা দোর ঠেলল। ওমা! দোর তো বন্ধ নয়। ঠেলতেই খুলে গেল। উঁকি দিল ভালুক-মা ঘরের ভেতর। চমকে উঠল। ওই তো, ওই তো তার ছেলে! টুং-এর গলা জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। টুংও ঘুমোচ্ছে ভালুকছানার গলা জড়িয়ে।

আঃ! বুকখানা জুড়িয়ে গেল ভালুক-মার। ইচ্ছে হল ছুট্টে যায় তক্ষুনি। টুংকে বুকে তুলে নেয়। ওর গালে চুমু খায়। এত ভালো টুং! দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল ভালুক-মায়ের।

না, টুং-এর ঘুম না ভাঙে! ঘুম ভাঙতে দেবে না ভালুক-মা। খুব আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে গেল। খুব আস্তে। ধীরে ধীরে হাত দু-টি সরিয়ে দিল টুং-এর। ঘুমন্ত ঠোঁট দু-টি ওর কেঁপে উঠল। একবার। পাশ ফিরে আবার শান্ত হয়ে গেল টুং। ও ঘুমোবে এখন। অনেকক্ষণ।

ভালুক-মা আস্তে আস্তে তুলে নিল ছানাকে নিজের কোলে। ঘর থেকে বেরোবার আগে চোখ মেলে দেখল ভালুকমা টুং-এর মিষ্টি মুখখানির দিকে আর একবার। ওর চোখ দু-টি ঘুমে ডুবে আছে। কাল সকালে ও যখন উঠবে, যখন দেখবে ওর পাশটিতে বন্ধু নেই, ওই চোখ দু-টি জলে ভেসে যাবে হয়তো তখন।

দাঁড়াল না ভালুক-মা। দোর ডিঙিয়ে, ঘর পেরিয়ে বনে পাড়ি দিল।

খুব সকালে উঠেছিল টুং সেদিন। সেদিন ও সর্বপ্রথম দেখেছিল তার বিছানার পাশটি। না, ছিল না ঝুমঝুমি। ভেবেছিল হয়তো ঝুমঝুমি আজ সকাল সকাল উঠেছে। বাইরে গেছে। এক-এক দিন তো ঝুমঝুমি ঘুম থেকে উঠেই বাইরে ছুটবে। ওর ভালো লাগে হয়তো। ভালো লাগে খুব সকালের মিষ্টি সোনা রোদ। একদিন ঝুমঝুমি একা একা নদীর ধারে চলে গেছল। দেখতে পেয়েছিল টুং। ভাগ্যিস! নইলে নদীর জলে পড়ে গেলে তখন? তখন কী হত?

ঘর থেকে ছুট্টে বেরিয়ে এল টুং বাইরে। ঘুম চোখে। ডাকল, ‘ঝুমঝুমি।’

না, ঝুমঝুমি এল না।

আবার ডাকল টুং, ‘ঝুমঝুমি-ই-ই-ই।’

এবারও দেখতে পেল না।

ঘরের ভেতরটা ভালো করে খুঁজল। ভারি দুষ্টু ঝুমঝুমি। যদি লুকিয়ে থাকে।

না, নেই।

এবার খুব চেঁচিয়ে ডাকল টুং, 'ঝুমঝুমি-ই-ই-ই-ই।'

ঝুমঝুমি থাকলে তবে তো!

ডালিম গাছের ফাঁকটা।

নেই, নেই।

শর্ষে খেতের ঝোপটা।

নেই, নেই।

বার-দরজার কোণটা।

নেই, নেই।

বুকটা চমকে উঠল টুং-এর। কই ঝুমঝুমি? গলায় যত জোর ছিল চেঁচাল সে, 'ঝুমঝুমি-ই-ই-ই-ই।'

রোদ দুলদুল সোনালি ফুল। ভালো লাগে না আজ দেখতে টুং-এর।

রং তুলতুল ফুল পাপড়ি। মন মানে না আজ তা দেখে।

নাচ ঝুমঝুম প্রজাপতি। মন নাচে না সে নাচ দেখে।

কই? কই? তার ঝুমঝুমি কই? না, না, দেখবে না সে। আজ সে কিচ্ছু দেখবে না। আজ শুধু ও খুঁজবে ঝুমঝুমিকে। ও ডাকবে, 'ঝুমঝুমি-ই-ই-ই।'

তবে কি ঝুমঝুমি নদীর ঘাটে গেছে?

ছুটল টুং। ছুটল আর ডাকল।

নদীর পাড়ে পাড়ে কাশ ফুলের ঢেউ লেগেছে।

ও ডাকে। ফুল দুলে দুলে ওঠে। আরও জোরে। জোরে জোরে। যত জোরে পারে ও ডাকে।

নেই ঝুমঝুমি। এখানেও নেই।

নদীর জলে লাফিয়ে পড়ল টুং। এ-পার ও-পার তোলপাড় করে খুঁজল সে। খুঁজতে খুঁজতে হাঁপিয়ে গেল। পেল না। উঠে পড়ল। ভিজে কাপড়ে ছুটল।

কোথা যাবে টুং ছুটতে ছুটতে?

বনে ছুটল।

ও হাঁপাচ্ছে। তবু দাঁড়াল না।

গলা কাঁপছে। তবু থামল না।

ও ডাকবে। গলায় ওর যত জোর আছে ও ডাকবে, 'ঝুমঝুমি-ই-ই-ই।'

মিষ্টি গলা তার কাঁপছে। ভাঙছে।

ছুটছে।

বনের কাঁটা বিঁধল। গা কাটল। কিচ্ছু মানল না।

হোঁচট খাচ্ছে। পড়ছে। উঠছে। তবু ছুটছে আর ডাকছে, 'ঝুমঝুমি-ই-ই-ই।'

আর পারল না টুং। পারল না আর ছুটতে। টলে টলে পড়ছে টুং। পা কেটেছে খান খান। রক্ত পড়ছে। গাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরল টুং টলতে টলতে। কেঁদে ফেলল। হ্যাঁ, এবার সে সত্যি কেঁদে ফেলেছে। হাউহাউ করে। ওর চোখ দু-টি উপছে গেছে কান্নার জলে। ও আর পারছে না। পারছে না দাঁড়িয়ে থাকতে। লুটিয়ে পড়ল। মাটিতে।

আর উঠতে পারেনি টুং। ওর মাথা ঝিমঝিম করছে। হয়তো আর একবার ভালুকছানার নাম ধরে ডেকেছিল টুং। সে-ডাক কারও কানে পৌঁছায়নি। তারপর আর কিচ্ছু জানে না। ওর চোখের পাতা দু-টি নেমে এসেছিল কাঁপতে কাঁপতে। ওর হাত দু-টি নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেল টুং।

অনেকক্ষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিল টুং বনের ছায়ায়। ওর চোখের তারা দু-টি অনেকক্ষণ অন্ধকারে ডুবে ছিল।

হঠাৎ যেন ওর চোখের পাতা দু-টি কেঁপে উঠেছিল। কানে কানে বেজে উঠেছিল ঝুরঝুর হাওয়ার ঝুমঝুম সুর। শুনতে পেয়েছিল টুং গাছের ডালে ডালে পাখির গান।

হঠাৎ মনে হল যেন, কে ওর গায়ে নরম তুলতুল মখমল বিছিয়ে দিয়েছে! কে যেন ওর বুকের ওপর মাথা রেখে আদর করছে!

চমকে উঠল টুং। না না, মখমল তো নয়! ওমা! ওমা! এ যে ঝুমঝুমি।

আদর করছে ঝুমঝুমি টুং-এর বুকে মাথা রেখে। কাঁদছে ঝুমঝুমির মা টুং-এর পাশে বসে। টুং-এর পা দু-টি কেটে গেছে। চেটে দিচ্ছে। আহা! রক্ত যেন না বেরোয় আর!

কোথা ছিল ওরা?

লাফিয়ে উঠল টুং! জড়িয়ে ধরল ঝুমঝুমিকে বুকের মধ্যে। 'দুষ্টু, দুষ্টু' বলে খুশিতে কেঁদে ফেলল টুং। ওর চোখ দু-টি জলে জলে টুপ টুপ। ঝুমঝুমির গালে চুমু খেল টুং। খুশিতে লুটিয়ে গেল। দেখল না ঝুমঝুমির মায়ের দিকে। মায়ের কান্নায় ভরা চোখ দু-টির দিকে।

না, না। ও এখন আর দেখবে না কিচ্ছু। ও খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে ঝুমঝুমিকে। ও এখন গাইবে। ও এখন নাচবে। ও এখন ঝুমঝুমিকে বুকে নিয়ে বনের ছায়ায় ছায়ায় ছুটে বেড়াবে।

'টুং!' কে যেন ডাকল। অনেক দূর থেকে।

বাবা ডেকেছে। বাবা যে খুঁজছে টুংকে।

'টুং রে-এ-এ-এ।' আবার ডেকেছে।

'বাবা-আ-আ-আ।' টুং সাড়া দিয়েছে।

ছুটল টুং ঝুমঝুমিকে পিঠে নিয়ে।

খুশি, খুশি! চারদিকে আজ খুশির দোলা।

ঠিক তক্ষুনি রোদ দুলদুল সোনালি ফুল ডালে ডালে নেচে উঠল।

রং ঝুরঝুর ফুলকুঁড়িতে প্রজাপতি নাচ ধরল।

কারা যেন জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। নাচের তালে তালে বেজে উঠেছে, টুং, টুং।

না, না, জলতরঙ্গ নয়! বাবা ডাকছে টুংকে, 'টুং, টুং, টুং।'

টুপ, টুপ, টুপ। জল পড়ছে ভালুক-মার চোখ দিয়ে ছলছল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে ভালুক-মা ছেলের দিকে, টুং-এর দিকে। ওরা কত খুশি! আহা!

কানকাটা বাঘ

বাঘকে যেমন বাঘের মতো দেখতে হয়, এ-বাঘটা একদম তেমন নয়। মুণ্ডুখানা যেমন তোবড়ানো, তেমনই ঠ্যাং চারটে ত্যাড়াবাঁকা। একটা চোখ এইটুকুনি, আর-একটা এত্তবড়ো। দুটো কানের একটি গেছে, একটি আছে মানে, কানকাটা বাঘ। ছি ছি, পাঁচজনের সামনে এ-মুখ বাঘ দেখায় কেমন করে! কেউ দেখলে নিশ্চয়ই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাঘকে রাগাবে:

'কান কাটা বেঁটে মোটা ত্যাড়াবাঁকা ঠ্যাং,

বাঘ না, শেয়াল এ যে ঘুমোয় সটান!'

যেই রাগাক তাকে তুমি দোষ দিতে পার না। অবশ্য বাঘ যদি রাগের কথা শুনে সত্যি সত্যি রেগে যায়, রেগে গাঁক করে কামড়ে তার টুঁটি ধরে লটকে দেয়, তবে অন্য কথা। আশ্চর্য ব্যাপার কী জানো, এ-বাঘটা রাগতেই জানে না। তুমি যতই হেঁকে হেঁকে বাঘকে হেনস্থা কর, বাঘ রাগবেও না, ডাকবেও না। চাই কী, মুখ খিঁচিয়ে গাঁক করে হাঁকবেও না। যেমন সটান শুয়ে আছে তেমনই শুয়ে থাকবে। আর মাঝে মাঝে একটু জোরে বাতাস বইলে বাঘ গা-ঝাড়া দিয়ে ঘুরে ফিরে এ-দিক ওদিক করবে।

বাঘটার বাতাস ছাড়া আর বন্ধুই নেই। সত্যি বলতে কী, বাতাসের দৌলতেই বাঘটা এমন একটা মনের মতো বনের ভেতর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে। আসলে, বাঘটা ঘুম ছাড়া আর কিছু জানে না। তাও কী, চোখ দুটো ড্যাবড্যাব করে চেয়েই ঘুমোবে। বাঘটার খিদেও নেই, তেষ্টাও নেই। কী বাঘ রে বাবা! এমনকী, হাঁটতে হাঁটতে আচমকা তোমার পা-ও যদি তার গায়ে ক্যাঁত করে একটি শট মেরে দেয়, তাতেও বাঘের গ্রাহ্যি নেই। দিব্যি আরামসে নাক ডাকাবে। ভুল হয়ে গেল! এ বাঘের ফুটো ফুটো দু-টি নাক আছে ঠিকই, কিন্তু সে-নাক ডাকতে জানে না। এমন হেঁয়ালি হেঁয়ালি কথা শুনে অবাক হচ্ছ, না? ভাবছ হয়তো, নাক থাকলে তো ডাকতেই পারে! হ্যাঁ, এ-কথাটা একশো বার সত্যি। তবে কী জানো, আসলে এ-বাঘ কাগজে আঁকা একটি ছবি।

অবশ্য এ ছবি যে কে এঁকেছে, কেউ জানে না। তবে যেই এঁকে থাকুক, মন্দ আঁকেনি। তার মানে এই নয়, সে একজন ওস্তাদ ছবি-আঁকিয়ে। ছবিটা দেখলে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে, বয়েসটা তার কচি কচি। সাতও হতে পারে, আটও হতে পারে। কিংবা তার কমও হতে পারে। তবে তাকে যখন আমরা কেউ দেখিনি, তখন আড়ালে তাকে নিয়ে কোনো কথা না বলাই ভালো। তার চেয়ে বরং যাকে দেখছি, সেই বাঘের কথাই শুনি।

খুব সম্ভব কাগজে-আঁকা বাঘটা কোথাও বন্দি ছিল। ওই যে শুনলে-না বাঘের বন্ধু বাতাস! বলতে পারি ওই বাতাসটাই বোধ হয় বাঘটাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এনেছে এই বনে। এ-কাজটা করতে বাতাসকে তো আর কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। বাতাস ইচ্ছে করলে গায়ে যেমন সুড়সুড়ি দিয়ে ফুরফুর করে বইতে পারে, তেমনই আবার দমকা ঝাপটা মেরে সব ওলটপালটও করে দিতে পারে। হবে হয়তো এমনই এক ঝাপটা মেরে বাঘকে বনে এনে ফেলেছে বাতাস। তারপর ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ঘুমোচ্ছে বাঘ। কে জানে কবে ঘুম ভাঙবে!

বলতে বলতেই একঝাঁক টিয়া উড়ে এল গাছের আড়াল ভেঙে বনের ভেতর। বুঝতেই পারছ একঝাঁক টিয়া মানে একঝুড়ি গল্প। সে কী ট্যাঁ ট্যাঁ সুরের টকটকানি! কেউ বলছে মটরশুঁটির গল্প, কেউ বলে ধানিলঙ্কার কথা, কারও মুখে কাশীর পেয়ারার রাশি রাশি সুখ্যাতি। সবচে পুঁচকে যে টিয়াটা, তার ও সবে কান নেই। মনও নেই। কেমন করে যেন তার চোখ পড়ে গেছে ওই বাঘটার দিকে। অনেকক্ষণ ধরে অবাক হয়ে সে বাঘের দিকেই চেয়ে ছিল। আর মনে মনে ভাবছিল, ওটা কী রে বাবা! এইটুকুনি একটা বাঘের মতো দেখতে! যখন দেখল, বাঘের মতো দেখতে বাঘটা নড়েও না, চড়েও না, তখন সে গাছের ডাল থেকে নেমে এল বনের মাটিতে।

ঝরাপাতার ওপর ডিঙি মেরে সে বাঘটাকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখতে লাগল। তার চার পাশে ঘুরতে লাগল। কই, কোনো সানও নেই, প্রাণও নেই। সে বাঘটার আরও একটু কাছে এগিয়ে গেল। এবার ডানা ছড়িয়ে বাঘের ঘাড়ের ওপর দিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। ডানার হাওয়ায় বাঘটা নড়ল বটে, কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। তখন পুঁচকে টিয়াটার বেড়ে গেল আরও সাহস। সে একেবারে ঝপ করে বাঘের গায়ের ওপর দিল লাফ! যেই না লাফ দেওয়া, টিয়ার ডানার ঝাপটায় বাঘের কাজ সারা। ছিল সোজা, গেল উলটে। মাটির দিকে বাঘের ছবি, চোখের ওপর সাদা কাগজ। ব্যস, শুরু হয়ে গেল তুলকালাম কাণ্ড। কোথাও কিছু নেই, বাঘটা চিৎকার করে উঠল, 'দম আটকে আসছে, দম আটকে আসছে, আমাকে সিধে করে দাও! আমি মরে গেলুম!'

বলব কী, চিৎকার শুনে ওই একঝাঁক টিয়া চোখের পলকে ফুড়ুৎ। পুঁচকে টিয়াও দে হাওয়া! কিন্তু পুঁচকেটা হাওয়া দিলেও রহস্যটা তো আর তার মাথা থেকে হাওয়া হচ্ছে না! তাই উড়ে গিয়েও চোখের পলকে আবার ফিরে এল। কাছ বরাবর একটা গাছের ডালে বসে উলটে-পড়া বাঘের হাঁসফাঁসানি শুনতে লাগল। এ কী কাণ্ড রে বাবা!

পুঁচকে টিয়া আর কতক্ষণ বসে থাকবে এই কাণ্ড দেখে! অত ধৈর্য কি আর পুঁচকেদের থাকে! ওই পুঁচকে টিয়ার মাথার ভেতর 'কী হয়' দেখার তাগিদটা এমন কিলবিল করে উঠল যে, সে আর থাকতে পারল না। ঝপ করে গাছ থেকে নেমে, একটু ইদিক-উদিক দেখে, ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল বাঘ-আঁকা কাগজটা। তারপর দিল উলটে। বলব কী, সঙ্গেসঙ্গে এক আজব কাণ্ড! কাগজে আঁকা বাঘটা একটা সত্যি সত্যি বাঘের মতো জ্যান্ত হয়ে 'হালুম' বলে একটা লম্বাই লাফ মারল। মেরেই খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। পুঁচকে টিয়াটার তো চক্ষু চড়কগাছ! সে পড়ি-মরি দিল লম্বা। ধড়ফড় করে উঠে পড়ল সামনের গাছটার একেবারে মগডালে। বাঘ হও আর যেই হও, আর তাকে ধরতে হচ্ছে না।

উফ, খুব বেঁচে গেছে পুঁচকেটা! ওইটুকু বুকের ভেতর পুঁচকেটার যতটুকু প্রাণ আছে এই এক ধাক্কায় সেটুকুও যায় বুঝি! যাই হোক, এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বেশ ক-টা ফিনফিনে হাঁফ ছেড়ে পুঁচকেটার যখন ঘোর কাটল তখন সে দেখল, বাঘটা থাপুস মেরে বসে নিজের গা চাটছে আর হাই তুলছে। কী রে বাবা, বাঘটা আবার ঘুমোবে নাকি! বাঘটাকে আরও একটু স্পষ্ট চোখে দেখার জন্য পুঁচকেটা নিঃসাড়ে মগডাল থেকে একটা নীচু ডালে নেমে এল। পাতার আড়াল থেকে উঁকি মেরে এই আজব বাঘের

ছিরিটা সে লক্ষ করার চেষ্টা করল। অবশ্য এখান থেকে চোখ নামিয়ে দেখতে তার কষ্ট হল না বলেই সে ফস করে নিজের মনে হেসে উঠল। এ কী বাঘ রে! দেখতে কেমন গেঁড়া গেঁড়া, মাথাটা কেমন ব্যাঁকাত্যাড়া, ঠ্যাং চারটে খাড়া খাড়া, একটা চোখ ট্যারা ট্যারা, গায়ের রং ছেঁড়া ছেঁড়া!

দেখেশুনে তার হাসিটা যখন মুখ দিয়ে ফসকে বেরোবে বেরোবে করছে, আর হাসিটাকে যখন সে মুখের ভেতর চেপে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তখন তার নজর পড়ে গেল বাঘের কানের দিকে। একটি কান আছে, আর একটি গেছে! সে আর থাকতে পারল না। ট্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ করে হেসে ফেলল। আর ঠিক তখনই একটা কাঠবিড়াল গাছের এ-ডাল ও-ডাল থেকে তিড়িংবিড়িং দিল ছুট। ছুটতে ছুটতে সিধে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। শুধু লাফিয়ে পড়ল না, বাঘটাকে সে বাঘ বলে ঠাওর করতে পারল না বলে সটান বাঘের পিঠের ওপর উঠে পড়ল। বাঘটা তো হকচকিয়ে গেছে। পিঠে চড়ে কে রে বাবা! বাঘ খুব জোরে একটা গা ঝাড়া দিল। কিন্তু কাঠবিড়ালের নড়তে বয়ে গেছে। ও মা, কাঠবিড়ালটা বাঘের পিঠ চাটতে শুরু করে দিল। এঃ বাবা কী ঘেন্না! যে জানে সে জানে বাঘের গায়ের গন্ধ কেমন। কেমন বিচ্ছিরি বোঁটকা! কাঠবিড়ালটার কি ঘেন্না নেই? কেমন চাটছে দেখো! চাটবেই তো! এ-বাঘ তো আর সে-বাঘ নয়। এ তো আঁকা ছবির বাঘ। এ-বাঘের গায়ে মিষ্টি মিষ্টি রং। মিষ্টি মিষ্টি রঙের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা যাবে কোথায়।

সে যাই হোক, এ দিকে কাঠবিড়ালের চাটাচাটিতে বাঘটা এমন ভয় পেয়ে গেল যে, সে মারল এক লাফ! লাফ মেরেই কাঠবিড়ালকে পিঠে নিয়ে দিল ছুট! আর তাই না দেখে পুঁচকে টিয়ার হাসতে হাসতে পেট ফাটার জোগাড়! হাসতে হাসতে সে উড়তে শুরু করে দিল। বাঘ যে দিকে যায়, পুঁচকে টিয়াও সে দিকে ওড়ে। উড়তে উড়তে চেঁচায়, 'ছুটো না বাঘ, ছুটো না, তোমার পিঠে কাঠবিড়াল।'

হতভম্ব কাঠবিড়ালটা, 'কী করবে, কী করবে' ভাবতে ভাবতে বাঘের পিঠ থেকে দিল লাফ-তিড়িং! লাফ দিয়েই সটান সামনের গাছটায় উঠে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

তবুও বাঘটা ছুটছিল। তবুও পুঁচকে টিয়া উড়ছিল আর হাসছিল। তারপর বাঘটা যখন বুঝল তার পিঠে আর চাটাচাটির শব্দ নেই, তখন সে থামল। যে গাছটার নীচে থামল, সেই গাছটার ওপরে ঝুপ করে বসে পড়ল পুঁচকে টিয়া। বাঘটা তখনও হাঁফাচ্ছিল। আর পুঁচকে টিয়াটা তখনও

হাসছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে বাঘটা ওপরপানে চাইছিল। পুঁচকে টিয়াটা হাসতে হাসতে এ-ডাল ও-ডাল নাচছিল। হঠাৎ বাঘের চোখে চোখ পড়তেই পুঁচকেটা বাঘকে কী জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে সে ফট করে বাঘকে বলে বসল, 'তুমি কেমন বাঘ? একটা কাঠবিড়ালির ভয়ে লেজ তুলে পালাও?'

বাঘ প্রথমটা কী উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। উত্তর দেওয়া ঠিক কি না সেইটা ঠিক করতেই তাকে বারকতক দম ফেলতে হল। তারপর চট করে বলে বসল, 'ওটার নাম কাঠবিড়ালি?'

পুঁচকে বলল, 'হায় কপাল, কাঠবিড়াল চেনো না?'

বাঘটা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেলেও পরক্ষণেই বুকটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল, 'ওটার নাম যদি কাঠবিড়ালি হয়, তোমার নামটা কী?'

'আমার নাম পুঁচকে।' বলে পুঁচকে টিয়া ডানাটা একটু নেড়ে দিল।

পুঁচকে নামটা শুনে বাঘের ভীষণ মজা লেগে গেল।

বাঘ বলল, 'পুঁচকে আবার কী ধরনের নাম! পুঁচ-কে। নামটা তোমার কাতুকুতু মেশানো। আমার হাসি পাচ্ছে।'

পুঁচকে বলল, 'তোমাকে দেখেও আমার খুব হাসি পাচ্ছে।'

'কেন?' বাঘ যেন একটু চমকে গেল।

'তোমার একটা কান নেই। তুমি কানকাটা।' বলে পুঁচকেটা খুব জোরে হেসে উঠল। আর ঠিক তখনই বনের ভেতর একটা শেয়ালও ডেকে উঠল। শেয়ালের ডাক শুনে বাঘটা এমন ঘাবড়ে গেল যে, সে একেবারে চোখ-কান বুজে দিল ছুট!

পুঁচকেটা বাঘের হঠাৎ এমন ছুট দেখে নিজেই কেমন থতমত খেয়ে গেল। কী রে বাবা! শেয়ালের ডাক শুনে বাঘ ছুটে পালায় কেন! ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে পুঁচকে বাঘের পিছু পিছু উড়ে চেঁচাতে লাগল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি? দাঁড়াও, দাঁড়াও!'

বাঘ বেশ খানিকটা ছুটে থামল। বেশ খানিকটা হাঁফাল। তার পরে কান পেতে শুনল। না, আর শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে না।

পুঁচকে টিয়া গাছের ডালে বসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ছুটলে কেন?'

বাঘ ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক চেয়ে পুঁচকে টিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'বিচ্ছিরি গলায় হুক্কাহুয়া বলে কে হেঁকে উঠল বলো তো?'

পুঁচকে টিয়া আরও জোরে হেসে উঠে উত্তর দিল, 'আরে ছ্যা ছ্যা, শেয়ালের ডাক শুনে তুমি পালিয়ে এলে! কোথায় শেয়াল তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবে, না, উলটে তুমিই ভড়কে গেলে!'

বাঘ কেমন যেন বোকা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'শেয়ালের চেয়ে আমি বুঝি বড়ো?'

'হায় রে, তাও জানো না?' হাসতে হাসতে থেমে উত্তর দিল পুঁচকে।

বাঘ একটা লম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, খুব রক্ষে কেউ দেখতে পায়নি।'

পুঁচকে টিয়া এবার বাঘকে একটু খোঁচা দিয়েই বলল, 'সত্যি বলতে কী, তুমি বাঘের নামে কলঙ্ক। তোমার যেমন একটা কান নেই, তেমনই তোমার সাহসও নেই। এই বনের অন্য বাঘ তোমাকে দেখতে পেলে তোমাকে বন থেকে তাড়িয়ে ছাড়বে। লজ্জা, লজ্জা! তুমি শেয়ালের ভয়ে পালাও!'

বাঘ যেন এবার একটু ভাবনায় পড়ল। আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায় বলো দিকিনি? আমার কী করা উচিত?'

পুঁচকে বলল, 'শেয়াল যখন চেঁচাল, তখন তো তোমার উচিত ছিল রুখে দাঁড়ানো।'

বাঘ উত্তর দিল, 'তারপর দেখে ফেলল!'

পুঁচকে দু-বার চোখের পাতা ফেলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দেখে ফেললে মানে?'

বাঘ উত্তর দিল, 'দেখে ফেললে মানে আমার কাটা কানটা!'

পুঁচকে বলল, 'সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছ। একটা কান না থাকা বাঘের পক্ষে খুবই লজ্জার!'

বাঘ খুবই অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এর একটা বিহিত করতে পার না?'

'কীসের বিহিত?' পুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

'আমার কানের যদি একটা বিহিত করে দিতে পার।'

পুঁচকে হেসে উঠল। বলল, 'তুমি তো বেশ কথা বলছ! কান নেই তোমার, আর আমায় বলছ বিহিত করে দিতে! আমি যদি তোমার মতো বাঘ হতুম, আর যদি আমার একটা কান কাটা থাকত, তবে দেখতে কবেই আমি নিজের কানের নিজেই বিহিত করে নিয়েছি। হাতির গায়ে যে অত জোর, সেই হাতিকেই ঘায়েল করে, হাতির কান ছিঁড়ে এনে নিজের কানে বসিয়ে নিতুম। আরে বাবা, বাঘ বলে কথা! গায়ে ক্ষেমতা কত!'

বাঘটা কেমন বোকার মতো জিজ্ঞেস করল, 'হাতিকে বুঝি বাঘ ছাড়া সবাই ভয় পায়?'

পুঁচকে জবাব দিল, 'পাবে না! হাতির তাকত কত! শুঁড় দিয়ে ধরবে আর পা দিয়ে চেপটে চ্যাটাং করে দেবে। বাঘ ছাড়া কার অত সাধ্যি হাতির সঙ্গে লড়ে!'

বাঘটা গা-ঝাড়া দিল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি বলছ হাতির সঙ্গে লড়াই করতে?'

'নিশ্চয়ই।' পুঁচকে জবাব দিল, 'মান-ইজ্জত যদি বাঁচাতে চাও তবে এখনই একটা হাতির কান ছিঁড়ে এনে নিজের কানে বসিয়ে নাও। কান তো কান, হাতির কান। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। তোমার কাটা কানে বসিয়ে নিলে তোমাকে যা দেখতে হবে না, দারুণ!'

বাঘের লেজটা যেন উত্তেজনায় ছটফটিয়ে দুলতে লাগল। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরে সাহসটা খামচাখামচি শুরু করে দিয়েছে। ঠিক আছে, তোমার কথাই সই। আমি হাতির সঙ্গে লড়াই করে তার কান ছিঁড়ব। কিন্তু হাতির দেখা কোথায় পাব, তা তো জানি না।'

পুঁচকে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে। আমি আকাশে উড়ে যে দিকে যাই, আমাকে দেখে দেখে সেই দিকে তুমি মাটিতে হাঁটো। বনের একটু ভেতরে না গেলে হাতির দেখা পাওয়া যাবে না।'

বাঘ জিজ্ঞেস করল, 'হাতি বুঝি বনের ভেতরে থাকে?'

পুঁচকে মুচকি হাসল। বলল, 'কেন, বনের ভেতরে যেতে তোমার ভয় করছে নাকি?'

বাঘ বলল, 'না, না, আর আমার ভয় করছে না। যতই হোক আমি তো বাঘ। তোমার কথা শুনে ইস্তক আমার বুকের ভেতরটা হাতি হাতি করে

হাঁফাচ্ছে। এখন আমার মনে হচ্ছে এখনই একটা হাতি দেখি, এখনই তার কান কাটি।'

ব্যস, বলতে-না-বলতেই সামনে একটা হাতি! পুঁচকে টিয়া দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঘ তুমি সাবধান হও! ওই তোমার সামনেই হাতি!'

কানকাটা বাঘের তো হাতি দেখেই ভয়ে পা ঠকঠক। তাই তো, এমন একটা ধুমসোর সঙ্গে লড়াই করা কি চাট্টিখানি কথা! তাই বাঘটা মনে মনে ভাবল, ঝুটঝামেলায় না গিয়ে হাতির কাছে ভালো মুখে একটা কান চাইলে কেমন হয়? সেইটাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাই কানকাটা বাঘটা হাতির মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে কিছু বলার আগেই, হাতিটা এমন হাতির মতো হেসে উঠল যে, তাই শুনে বাঘের গা-পিত্তি জ্বলে গেল। কোথায় ভালো মুখে কথা বলে হাতির সঙ্গে একটা রফা করবে, তা নয়, হাতি বাঘকে দেখে হেসে দিল। কী বিচ্ছু হাতি রে বাবা! মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেল বাঘের। খুব কড়া গলায় কানকাটা বাঘ গর্জে উঠল, 'তুই হাসছিস কেন রে হাতি?'

হাতি হাসতে হাসতেই উত্তর দিল, 'হাসি পেলে না হেসে থাকি ক্যামনে?'

বাঘ আরও রেগে গেল। বলল, 'হাসি পেলে মানে? অত বড়ো একটা ধুমসো হাতি, তার যখন-তখন হাসি পেলেই হল! কীসের জন্য হাসি পাবে?'

হাতি হাসতে হাসতেই বলল, 'তোকে যে দেখবে সে-ই হাসবে।'

'জানিস, আমি বাঘ!' দম্ভে ফেটে পড়ল বাঘ।

হাতি বলল, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে কানকাটা বাঘ।'

ব্যস! ভস্মে যেন ঘি পড়ল। বাঘ গর্জে উঠে ধমক মারল, 'তোর সাহস তো কম নয়। আমায় তুই কানকাটা বলিস! তবে তোরই কান কাটি আমি!' বলে বাঘ হাতির ঘাড়ে পড়ার জন্য গাঁক করে লাফিয়ে উঠল। যেই-না বাঘ লাফিয়েছে অমনি হাতি শুঁড় দিয়ে বাঘকে লুফে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। তার পরেই লেগে গেল ঝটাপট। বাঘ চার পা ছুড়ে যতই গাঁক গাঁক করে লাফায়, হাতি ততই শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাঘের দফারফা করে দেয়। শুঁড় দিয়ে হাতি বাঘকে একবার শূন্যে তোলে, একবার নীচে নামায়। আবার তোলে, আবার নামায়। তারপর আচমকা বাঘকে এমনই তোল্লাই

দিয়ে ছেড়ে দিল যে, বাঘ মাটির ওপর ঘাড় গুঁজে ধপাস! যেই মাটিতে পড়া, অমনি হাতি বাঘের পেটটা চেপে ধরল পা দিয়ে। যেই-না চেপটে ধরা সঙ্গেসঙ্গে ফুস-স-স! অত বড়ো বাঘটা চোখের পলকে কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল, বোঝাই গেল না! দেখা গেল, জ্যান্ত বাঘের বদলে হাতির পায়ের তলায় একটা কাগজ। আর সেই কাজগে আঁকা ছবি-ছবি বাঘটা। হাতি তো দেখেশুনে তাজ্জব! ভাবল, যাঃ বাব্বা! এ কী বাঘ!

আর গাছের ডালে বসে বসে সেই পুঁচকে টিয়াটা ভাবল, একেই কি বলে ম্যাম্যাজিক! হবে হয়তো!

ইড়িং আর বিড়িং

এ বাবা এ আবার কেমন নাম-ইড়িং, বিড়িং!

নাম শুনে ঠোঁট ওলটালে বুঝি? তা, তুমি ঠোঁট ওলটালে কী হবে, নাম দুটো তো ওরা শখ করে নিজে নিজে রাখেনি! কে রেখেছে, তা-ও ওদের জানা নেই। ওদের বলতে আমি যাদের কথা বলছি সেই ইড়িং, বিড়িং পিঠোপিঠি দুই ভাই। বড়োটির নাম ইড়িং আর পরেরটির নাম বিড়িং। তা বলে যেন ভেবো না বড়োটির সঙ্গে পরেরটির দু-এক বছরের এদিক-ওদিক। উঁ-হুঁ, মোটেই না! বরং বলতে পার দু-এক মিনিটের ছোটো-বড়ো! তার মানে যমজ ভাই। বললে বিশ্বাস করবে না, দু-ভায়ের মুখের এমন আদল কার সাধ্যি চেনে, কে ইড়িং আর কে বিড়িং! দু-জনের বয়সও যে খুব একটা, তেমনও না। খুব বেশি হলে নয় কি দশ।

এখন তুমি জিজ্ঞেস করতেই পার, বলা নেই, কওয়া নেই খামোখা ইড়িং, বিড়িংকে নিয়ে পড়লে কেন?

পড়ব না? খামোখা ছেলে দুটো যদি একটার পর একটা বিপদে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়, তবে কোন মানুষটা চুপ করে থাকতে পারে বলো? আচ্ছা, কারও বাড়ির চারপাশটা যদি সবুজ সবুজ গাছে আর রঙিন রঙিন ফুলে উছলে থাকে, তার ওপর সেই সবুজের গা ছুঁয়ে যদি নদী ঢেউ খেলে বয়ে যায়, তবে কার না সুন্দর দেখতে লাগে শুনি! সেখান থেকে চোখ ফেরানো যায় কি?

ঠিক এমনই একটা সবুজে ঘেরা নদীর ধারে ছিল ইড়িং, বিড়িংদের ছোট্ট বাড়িটা। বাবার ছিল নৌকো, বাবা মাছ ধরতেন। আর মায়ের ছিল ঘর-সংসার, মা ঘর সামলাতেন। আদরে-দরদে ছেলে দু-টিকে নজরে রাখতেন। অবশ্য নাম দু-টি অমন হাসিমাখা হলে কী হবে, ছেলে দু-টি কিন্তু ভালো। মা বললে উঠবে, মা বললে বসবে। মা বললে পড়বে, মা বললে খেলবে। কিন্তু মা যদি বলেন নদীর ঘাটে যেয়ো না, তখনই দুই ভাইয়ের মুখ গোমড়া। মায়ের বারণ কানেই নেবে না। উলটে নদীর ঘাটে ছুটবে। নদীর জলে সাঁতার কেটে এপার-ওপার তোলপাড় করবে।

তবু ভালো দু-ভাই মায়ের সব কথাই শোনে, একটা কথাই শোনে না। নদীর জলে সাঁতার তারা কাটবেই। কাটুক। বাবাও তো নদীর জলে নৌকো

ভাসিয়ে মাছ ধরেন। তার বেলা! তবে কি বড়ো হয়ে তারাও বাবার মতো মাছ ধরবে! হাটে বেচে আসবে! মাছের ব্যাপারী হবে! তাহলে তো ভালোই।

কিন্তু...

কিন্তু কেন?

ছেলেরা যে অন্য কথা বলে!

কী বলে?

বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেন, 'ইড়িং, তুমি বড়ো হয়ে কী হবে?'

'আমি বনের রাজা হব।'

কী আশ্চর্য, ইড়িং একমুহূর্তও ভাবল না। চটপট উত্তর দিল।

বাবা বলেন, 'বনের রাজা তো বাঘ।'

ইড়িং বলে, 'আমি বাঘই হব।'

ছেলের কথা শুনে বাবা একেবারে থ!

এবারে বাবা বিড়িংকে জিজ্ঞেস করেন, 'বিড়িং বড়ো হয়ে তুমি কী হবে?'

বিড়িং বলে, 'আমি আকাশের রাজা হব।'

বাবা বলেন, 'আকাশ তো পাখিদের। পাখিদের রাজা তো ইগল।'

বিড়িং বলে, 'আমি ইগলই হব।'

ছেলের কথা শুনে বাবা তো বেবাক হাঁ!

তা আর কী করা! বাবা শুধু মনে মনে ভাবেন :

এক ছেলে বাঘ হবে

এক ছেলে পাখি,

মায়ে-বাপে একা একা

কাকে নিয়ে থাকি!

অবশ্য, কথা বলতে তো আর পয়সা লাগছে না! যা খুশি বলে যাও কেউ মানাও করছে না! তবে বললেই তো আর মানুষ বনের বাঘ হচ্ছে না, আকাশের পাখিও না। যেমন মাটিতে দু-পা ফেলে হাঁটছ, তেমনই হাঁটবে।

যেমন দু-চোখে দেখছ, তেমনই দেখবে। যেমন দু-কানে শুনছ, তেমনই শুনবে। এমনকী ওই নদীর জলে যেমন করে ছলছলিয়ে সাঁতার কাটছ, তেমনই কাটবে।

এ্যাই হয়েছে! নদীর কথাই উঠেছে। এই নদীর কথা উঠল বলেই সেই সাংঘাতিক গল্পটাও শুরু হয়ে গেল।

সাংঘাতিক গল্প?

তবে আর বলছি কী! সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক! হয়েছে কী, মিথ্যে বলব না, আলোভালো ছেলের মতো সে-বছর বর্ষা এল ঠিক সময়ে। শুকনো খটখটে খেত জলে-কাদায় নরম হল। মাঠে লাঙল পড়ল। ফল-ফসলের বীজ ফুটে কচিপাতা মাথা নাড়ল। আর ঠিক তেমন সময় একদিন ঝোড়ো মেঘে আকাশ ঢাকল। বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল। তুমুল বেগে বৃষ্টি নামল। সে বৃষ্টি আর থামে না। একেই তো টইটই করছিল নদী বর্ষার জলে, তার ওপর একটানা বৃষ্টিতে নদী উঠল ফুলেফেঁপে। উপচে পড়ল খেত-খামারে। দেখা দিল বান। ভেসে গেল খেতের ফসল। ভেসে পড়ল বাড়িঘর। বানের টানে আথালপাথাল করতে করতে কে যে ডুবল আর কে যে কোথায় ভাসল, তার খবর আর কে রাখছে!

এমনই যখন ভয়ংকর বিপদ মানুষের, তখন সে-বিপদের কবল থেকে ইড়িং বিড়িংরা যে রেহাই পাবে সে তো আর হয় না। ভাসল তারাও। এমনকী বানের স্রোতে হারিয়ে গেল তাদের মা-বাবাও। তবে এই রক্ষে যে, দু-ভাই সাঁতার জানত। সাঁতার জানত বলেই বানের সঙ্গে লড়াই করে কেউ কারও কাছছাড়া হল না।

উফ! বলতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! ওই দেখো ছেলে দুটো নদীর দুর্ধর্ষ স্রোতে নাকাল হয়ে কী ভীষণ হাবুডুবু খাচ্ছে! এক্ষুনি না তলিয়ে যায়! ইস! অমন চনমনে ছেলে দুটো এই বয়সে প্রাণ হারাবে! না, আর দেখা যায় না-ওদের কষ্ট। আপনা থেকেই চোখ বুজে আসে!

কিন্তু চোখ তো আর কেউ অনন্তকাল বুজে বসে থাকতে পারে না। তাকে খুলতেই হয়। কিন্তু একী! চোখ খুলেই তুমি অমন করে চমকে উঠলে কেন? কী দেখলে?

দেখা গেল, বানের তোড়ে ধ্বস্ত দুটো ছেলে পা ছড়িয়ে একটা গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে হাঁপাচ্ছে।

হ্যাঁ, তাইতো! তার মানে ইড়িং, বিড়িং বানের টানে তলিয়ে যায়নি! খুঁজে পেয়েছে কূল। ওই তো দেখা যাচ্ছে কূল ঘেঁষে উঁচু বাঁধ। বাঁধ টপকালেই একটা বন। আর, এই বনেরই গাছে ঠেসান দিয়ে হাঁপাচ্ছে ওরা। যাক, তবু ভালো ছেলে দুটো প্রাণে বেঁচে গেছে।

তা অবশ্য বলতে পার। কিন্তু বলতে পার না বিপদ একেবারে কেটে গেছে! বানের তোড়ে কোথায় গেলেন বাবা-মা, জানে না তারা। বনের কোন পথ পেরিয়ে ঘরের পথ খুঁজবে সেটিও জানা নেই। নিজেরাই নদীর সঙ্গে লড়াই করে এখন এমন দমসম হয়ে ধুঁকছে, শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচলে হয়!

ছি ছি, এ কী অলুক্ষুণে কথা মুখে আনছ! ওসব কথা না ভেবে, বরং ছেলে দুটোর মুখের দিকে একবার তাকাও! কী মনে হচ্ছে? দেখে মনে হচ্ছে না, ক্লান্তির ছাপ যেন ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে ওদের মুখ থেকে? দেখো, দু-ভাই কেমন অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে! যতটা অবাক ততটাই কি ভয় ছেয়ে আছে ওদের চোখে-মুখে!

ওমা! একী! বলতে-না-বলতেই তো ইড়িং উঠে দাঁড়াল!

তাই তো! বিড়িংও যে উঠে দাঁড়ায়! দু-জনেই যে ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে দেখে! হয়তো ভাবছে কী হবে এখন! ভাবছে হয়তো, কোন পথ দিয়ে কোথায় যাবে! কোন পথ দিয়ে বন পেরিয়ে চেনা পথ খুঁজে পাবে! আচমকা এমন একটা ভয়ানক ঘটনার চক্করে পড়ে ছেলে দুটো যে ভীষণ হকচকিয়ে গেছে, সে তো তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তার মানে, এই সুনসান বনে চিল চেঁচিয়ে কান্না জুড়বে নাকি ইড়িং, বিড়িং?

খবরদার, খবরদার! ওটি কোরো না! কান্না জুড়লে কে বলতে পারে, তুমি এই বিপদ থেকে আর এক বিপদে পড়বে না! তবে বাহাদুর বটে ছেলে দুটো। ওদের চোখ দিয়ে জল তো গড়ালই না, বরং দু-ভাই চোখের ইশারায় বন ডিঙিয়ে ইতিউতি পথের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু মুশকিল কী হল, পথ খুঁজতে খুঁজতে তারা যে বনের গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে, সেটাই খেয়াল করল না। নদীর জলে ডুবে যাওয়া এক জিনিস, মানে তোমার প্রাণ গেল। আর বনের পথে হারিয়ে যাওয়া আরেক জিনিস, মানে তুমি রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়লে! আর বলতে কী, ছেলে দুটো সত্যি সত্যি পথ খুঁজতে খুঁজতে রহস্যের জালে জড়িয়েই পড়ল! এদিকে গাছে গাছে পথ আটকে, ওদিকে গাছে গাছে আঁধার জাপটে! কী দারুণ নির্জন। আশ্চর্য, একটা পাখির ডাক পর্যন্ত কানে আসে না। এখন এটা বোঝাই যাচ্ছে, ওরা বন

থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে খুঁজতে, খেই হারিয়ে ফেলেছে! না পারে পিছোতে, না পারে এগোতে! এবার কী হবে!

এতক্ষণ বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে, ওদের মুখে কোনো কথাই ছিল না। বুঝি ভুলেই গেছল কথা বলতে। এবার শোনা গেল ইড়িং-এর ক্লান্ত গলার স্বর। ভাইকে ভয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বিড়িং, কী হবে?'

বিড়িং উত্তর দেবে কী, মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এক আজগুবি কাণ্ড! এই ঘিঞ্জি বনের আড়াল থেকে কে একটা মেয়ে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল :

'বিপদ আসে সঙ্গে নিয়ে আরেক বিপদ
গলায় গলায় দোস্তি,
বাঘ যদি খায় হাড় কড়মড় কামড় দিয়ে
আছাড় মারে হস্তি!'

এ কী ভয়ানক কথা! এই নির্জন বনের আড়াল থেকে আচমকা কে কথা কইল! ইড়িং, বিড়িং দু-ভাই-ই থতমত খেয়ে গেছে! চমকে চমকে এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর ভাইকে ভাই জড়িয়ে ধরে! আর ঠিক তক্ষুনি সেই মেয়ে আবার বলে ওঠে:

'যতই এখন চেষ্টা কর
নেই পালাবার পথ,
এক্ষুনি এক আসবে বুড়ি
বিচ্ছিরি বদখত!
দেখলে তাকে আঁতকে উঠে
কান্না যদি ধর,
আমার মতো তোমাদেরও
বিপদ ভয়ংকরও।'

মেয়ের কথা শুনে ভয়ে পেটের মধ্যে হাত-পা যেন সেঁধিয়ে যায় দু-ভাইয়ের। সামনে ছোট্ট কি খাট্টো কোনো মেয়েকেই তারা চোখে দেখছে না, অথচ তার অস্ফুট কিন্তু স্পষ্ট কথা শুনতে পাচ্ছে। সে কি এই ঘন বনের কোনো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে!

না, না, তেমনটা মোটেই না। মনে হয়, মেয়েটাও বোধ হয় বনের গোলকধাঁধায় বন্দি। মনে হয়, বিচ্ছিরি বুড়িটাই তাকে বন্দি করে রেখেছে! থাকতে পারল না বিড়িং। মেয়েটার মতো ফিসফিস করে সে-ও বলে উঠল, 'আমাদের সঙ্গে কথা বলছ তুমি কে?'

বিড়িংকে কথা বলতে দেখে ইড়িংও সাহস পেয়ে গেল। সে-ও অদৃশ্য মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'কথা বলছ, অথচ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

সে উত্তর দিল, 'আমার নাম টুই। এই সেদিন পর্যন্ত, এখন তোমাদের আমি যেমন দেখছি, আমাকেও তেমন সবাই দেখতে পেত। কিন্তু একদিন কী হল, আমি যখন একা একা ইস্কুলে যাচ্ছিলুম, কোত্থেকে একটা বুড়ি আমার কাছে এল। আমার পথ আগলে দাঁড়াল। কথা নেই, বার্তা নেই রাস্তা থেকে ফস করে একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে ফুস বলে আমার গায়ে ছুড়ে দিল। তারপরে যে আমার কী হল আমি কিছু জানি না। আসলে, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম। আমার যখন জ্ঞান হল দেখলুম আমি এই বনে পড়ে আছি, আর সেই বুড়িটা আমার সামনে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে! কী বিতিকিচ্ছিরি দেখতে তাকে! আমি ভয়ে চিলচেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম।

'ঘটল উলটো বিপত্তি! হল কী, আমি যতই কাঁদছি, আর আমার চোখ দিয়ে যতই জল গড়াচ্ছে, সেই জল আর জল থাকছে না। ঝাঁক ঝাঁক শকুন বেরিয়ে আসছে সেই জল থেকে। চোখের নিমেষে ডানা ঝাপটে তারা ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নিল শূন্যে। আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি। হাত-পা ছুড়ে টান মারি। পারি না। তারা শূন্যে উড়তে উড়তে আমাকে কালো মেঘের মধ্যে ভাসিয়ে দিল। শেষমেষ আমি মেঘের সঙ্গে মেঘ হয়ে ভাসতে লাগলুম আকাশে। তারপরে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়লুম এই বনে। সেই থেকে আমার স্বর আছে গলায়, কিন্তু প্রাণ আছে মেঘের রাজ্যে। আমি এখন বৃষ্টিকণা।'

এমন উদ্ভট কথা শুনে ইড়িং, বিড়িং ভয়ে কাঁটা। দু-জনের মুখে আর কথা সরে না। আকাশে চোখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আর হয়তো মনে মনে ভাবে এমনও হয়! এদিকে কখন যে সেই বুড়িটা চুপিসারে তাদের পেছনে এসে ঝাঁকি দিচ্ছে, সেটি তারা টেরই পায়নি। হঠাৎ যখন বুড়িটা খ্যানখ্যানে গলায় ঘং ঘং করে হেসে উঠল, তখন টনক নড়েছে। আঁতকে উঠে, ফিরতেই দু-ভাইয়ের চোখ কপালে! বিড়িং বুড়ির মূর্তি দেখে এমনই ভয় পেয়ে গেল যে, সে কেঁদেই ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সেই

অদৃশ্য টুই নামে মেয়েটি যা বলেছিল ঠিক তেমনটাই ঘটে গেল! বিড়িং-এর চোখের জল থেকে ঝাঁক ঝাঁক শকুন বেরিয়ে এল! এদিকে এই ভালো যে, ইড়িং ভয় পেল ঠিকই, কিন্তু কাঁদল না। কাঁদলে, পাছে তার চোখের জল থেকেও শকুন বেরিয়ে আসে, তাই সে হি-হি করে হেসে উঠেছে! হাসি তো হাসি, এমন হাসি কে তাকে থামায়!

কিন্তু অবাক কাণ্ড!

কী কাণ্ড?

ইড়িং-এর হাসির তোড়ে এযে দেখি ঝাঁক বেঁধে ভিমরুল উড়ে আসছে ভোঁ ভোঁ করে! তারপরেই দেখো আরেক কাণ্ড! বিড়িং-এর চোখের জল থেকে বেরিয়ে সেই ঝাঁক ঝাঁক শকুন যখন বিড়িংকে ছোঁ মেরে শূন্যে তুলতে যায়, অমনি সেই অসংখ্য ভিমরুল শকুনদের ঘিরে ধরে! হুল ফোটায়! ফলে, বিড়িংকে তো ছোঁ মারা হলই না, উলটে, শকুনদের সে কী আছাড়-পাছাড় কাণ্ড! পালা, পালা, পালা! কিন্তু পালাবে কোথায়! শকুনরা যেদিকে পালায়, ভিমরুলের দল সেইদিকেই তাড়া করে।

নষ্টের ধাড়ি সেই বুড়িটা এতক্ষণ এখানেই দাঁড়িয়েছিল। সে যেই দেখেছে ভিমরুলের হুলের জ্বালায় শকুনরা আছাড়-পাছাড় করে পালাচ্ছে, অমনি বুড়িটাও প্রাণের ভয়ে দিল দৌড়!

কিন্তু দৌড় দিয়ে সে-ই বা যাবে কোথায়? সঙ্গেসঙ্গে একঝাঁক ভিমরুল ধরল বুড়িকে ছেঁকে। ছেঁকে ধরেই হুল ফোটাতে লাগল। ভিমরুলের হুল, বুঝতেই পারছ তার কী জ্বালা! উফ! তার ওপর একটা নয়, দুটো নয়, ছেঁকে ধরেছে হাজার হাজার ভিমরুল। আর দেখতে হয়! সেই শয়তান বুড়িটা হাত-পা ছুড়ে মরাকান্না শুরু করে দিল, ‘ওরে বাবা রে, কে আছিস রে, আমায় বাঁচা রে!’

বিড়িং তো এতক্ষণ ভয়ে কাঁদছিল! কিন্তু এখন বুড়ির কান্না শুনে তার হাসি পেয়ে গেল। সে হেসে ফেলল! বুঝতেই পারছ, এখন দু-ভাই একসঙ্গে হাসছে। যতই হাসছে ততই অগুন্তি ভিমরুল হাওয়ায় ভেসে আসছে। বুড়ির গায়ে বসছে। হুল ফোটাচ্ছে আর বুড়ি চেঁচাচ্ছে, ‘ওরে হাসি থামা, হাসি থামা! আমায় বাঁচা! ছাড়, ছাড়।’

ইড়িং, বিড়িং এখন বুঝতেই পেরেছে, তারা বাগে পেয়েছে বুড়িকে। তাই তারা বুড়িকে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

‘ইড়িং বিড়িং আমরা দু-ভাই

বোন আমাদের টুই,

ফিরিয়ে তাকে দিলেই তবে

ছাড়ান পাবি তুই!

নইলে বুড়ি নেইকো ছাড়ান

থামবে নাকো হাসি,

হুল ফুটিয়ে মারবে তোকে

ভোমরা রাশি রাশি!'

বুড়ি তখন ভিমরুলের হুলের জ্বালায় 'আঃ' করছে, 'উঃ' করছে, আর 'প্রাণ গেল রে, প্রাণ গেল রে' বলে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে! গড়াগড়ি খেতে খেতেই হঠাৎ বুড়ি তার হাত দুটো শূন্যে তুলে চিৎকার করে উঠল:

'এঁটে-বেঁটে খেঁটে-খেঁটে দুইখানা হস্ত,

ফুসফাস মন্তরে হয়ে যা তো মস্ত!'

এমনি ইড়িং, বিড়িং-এর চোখের সামনে ঘটে গেল সে এক তাজ্জব কাণ্ড! বলতেও বুক ধড়ফড় করে, আবার না বললেও হাঁসফাঁসানি থামে না। হল কী, বুড়ির মন্তর বলা যেই শেষ হয়েছে, অমনি তার শূন্যে তোলা হাতদুটো চড়চড় করে চাড়া দিয়ে আকাশের দিকে ধেয়ে গেল। তখন আকাশে একটা কালো মেঘ ভাসছিল। সেই ভাসন্ত মেঘের ভেতর বুড়ি তার ইয়া লম্বাই হাত দুটো ঢুকিয়ে একটি ফুটফুটে মেয়েকে বার করে আনল। ওই আকাশছোঁয়া উঁচুতে বুড়ির হাতের মুঠোয় মেয়েটি তখন দুলছে। তারপরেই বুড়ির ওই লম্বাই হাত তরতর করে গুটিয়ে যেতে লাগল। গোটাতে গোটাতে যখন আবার আগের মতো হয়ে গেল তখন মেয়েটি দাঁড়িয়ে ইড়িং বিড়িং-এর সামনে। মুখখানি তার হাসি হাসি!

তাকে দেখে প্রথমেই ইড়িং বিড়িং-এর চোখে লাগল ধাঁধা!

তারপরে ভয়ে মুখ সাদা!

শেষমেষ এক্কেবারে হাঁদা!

আর ঠিক তক্ষুনি মেয়েটি হাসিমুখে ডাক দিল, 'দাদা!' এখন কে না জানে এই মেয়েটিই সেই মেয়েটি-টুই!

ব্যস! তখনই তিন জনে একসঙ্গে হেসে উঠল হা-হা! হো-হো! হি-হি! কিন্তু আশ্চর্য কী, তখন সব ফাঁকা। ভিমরুলও নেই, শকুনিও নেই! এমনকী সেই নষ্টের ধাড়ি বুড়িটাও নেই! হাসতে হাসতে ওরা এমনই বিভোল হয়ে গিয়েছিল, কখন যে বুড়িটা সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে, সেটা পর্যন্ত ওরা খেয়াল করেনি।

যাক গে যাক, কিন্তু ভয় তো যাচ্ছে না! বুড়িটা এক্ষুনি এসে আবার যদি বিপদ ঘটায়! কাজেই, এখান থেকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। যেতে হবে বনের বাইরে। কিন্তু বাইরে যাবার পথটাই তো ওরা হারিয়ে ফেলেছে! তাহলে!

এমন সময় টুই বলে উঠল, 'না, না, ভয় পেয়ো না। বনের থেকে বেরিয়ে যাবার পথ আমার জানা আছে। আমি আকাশে মেঘে মেঘে ভাসছিলুম যখন, তখন ওপর থেকে চিনে রেখেছি পথ। দেখে রেখেছি কোন পথে আমাদের বাড়ি। চলো আমরা এক্ষুনি পালাই!'

সত্যিই তখন ইড়িং বিড়িং ছুটল, টুই ছুটল বনের যে-পথ ধরে সেই পথে।

ছুটতে ছুটতে ইড়িং জিজ্ঞেস করল, 'টুই, এই পথ দিয়ে গেলে বন পেরিয়ে তোমাদের বাড়ির পথ পড়বে?'

টুই বলল, 'হ্যাঁ।'

বিড়িং জিজ্ঞেস করল, 'আমাদেরও বাড়ির পথ কি এই পথে?'

টুই উত্তর দিল, 'বন থেকে বেরোলে তবেই তো চেনা যাবে কোন পথটা তোমাদের, কোন পথটা আমাদের। এখন আমাদের আর কিচ্ছু ভাববার নেই। বুড়ির হাত থেকে বাঁচার জন্যে বনের পথে ছুটতে হবে।'

হ্যাঁ, তারা ছুটতে ছুটতে বনের বাইরে এসেছিল। বনের বাইরে এসে টুই তাদের বাড়ির পথ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু নিজেদের বাড়ির পথ খুঁজে পায়নি ইড়িং, বিড়িং। এবার কী হবে তাহলে?

টুই বলল, 'কিচ্ছু ভয় নেই। এখন চলো তোমরা আমাদের বাড়িতে। আমারও মা আছেন, বাবা আছেন, আমার ভাই আছে। যতদিন না তোমাদের বাড়ির পথ খুঁজে পাই। তোমরা আমাদের বাড়িতে থাকবে। আমার মা, বাবা, ভাই, দেখো সবাই তোমাদের খুব ভালোবাসবে।'

ভালো কথাই বলল টুই। সায়ও দিল ইড়িং, বিড়িং। চলল টুইয়ের বাড়িতে। তারপর একদিন কেমন করে খুঁজে পেয়েছিল তাদের বাড়ির পথ, খুঁজে পেয়েছিল মাকে, বাবাকে, সে আরেক গল্প। সে-গল্প শুনব আরেকদিন।

1st blurb

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ওটা কী পড়ল রাস্তায় এই মাত্তর। আকাশে উড়ে যাচ্ছিল এক নীল পাখি। তারই ডানা থেকে খসে পড়া একটি নীল পালক। রাস্তায় এমন কত কী পড়ছে। পাখির পালক, গাছের শুকনো পাতা, বাতিল কাগজের ফুল-আরও কত কী! কাগজের ফুলের ভারি দেমাক। সে তো ঘর সাজানোর ফুল। গাছের রঙিন ফুল সময়ে ঝরে যায়, কিন্তু সেতো ঝরে পড়ে না, সবসময় ঝলমল করতে থাকে। তার আশা, কেউ তাকে কুড়িয়ে নিয়ে ফের ঘর সাজাবে। তাই সে কাউকে পাত্তা দেয় না। সত্যি একদিন এক টাট্টু ঘোড়া এল টগবগিয়ে, তার সওয়ার নেমে এসে ঘোড়ার রঙিন তাজ সাজাবার জন্যে তুলে নিল কাগজের ফুলটি, তারপরে ধুলো মাখা নোংরা সেই ফুল দূরে ছুঁড়ে ফেলল, আর তুলে নিল পাশের নীল পালকটি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, আহা, এটি তাজের মাঝে রাখলে দারুণ মানাবে। ঘোড়া চলে গেল টগবগ টগবগ টগবগ করে ফ্যালফেলিয়ে পড়ে রইল কাগজের ফুল।

এমন সব গল্পে ছোটোদের মনে ভালো হবার স্বপ্ন বুনে দেন শৈলেন ঘোষ। আশ্চর্য আলোর ভুবন গড়ে ওঠে।

2nd blurb

শৈলেন ঘোষ জন্মেছেন কলকাতার বাগবাজারে মামাবাড়িতে ১৯২৮-এর ৮ ডিসেম্বর। ছোটোবেলা কেটেছে হাওড়ায়। ছোটোবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু। আনন্দবাজার পত্রিকার ছোটোদের পাতা আনন্দমেলায় লিখে পরিচিতি পান। প্রথম উপন্যাস টুই-টুই। বাংলার বিখ্যাত রূপকথার কাহিনি অরুণ বরুণ কিরণমালার নাট্যরূপ দিয়ে পরিচালনা করেন। তাঁর সেই নাটক রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পায়। তারপরে তাঁর ছোটোদের নাট্য প্রতিষ্ঠান শিশু রঙ্গণের প্রযোজনায় তাঁর অসংখ্য নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। টুই-টুই-এর পর তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন। গল্প লিখেছেন। মিতুল নামে পুতুলটি, ছোট্ট সোনার গল্প শোনো, বাজনা-তাঁর বিশেষ প্রশংসিত গল্পগ্রন্থের কয়েকটি। ছাত্রজীবনে ছুটির সানাই নামে একটি ছোটোদের মাসিক পত্রিকা বের করে তাক লাগিয়ে দেন। যাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বন্ধু দিলীপ দে চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় রবিবার নামের সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করা।

জীবনে অনেক পুরস্কার-সম্মান পেয়েছেন। যার অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শিশু সাহিত্যে বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার।